দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৯ বর্ষ, ৯ সংখ্যা।। ১৬ নভেম্বর, ২০২৬।। ২৯ কার্তিক, ১৪৩৩।। যুগাব্দ - ৫১২৮।। website : www.eswastika.com



ড. অশোক সেন

পদার্থবিজ্ঞানে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি-স্বরূপ অস্কার-ক্লেইন সম্মানে সম্মানিত। স্বস্তিকার পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন

आरोग्यम 108

CONDUCTS



a 108 Hours of Religious, Historical & village tour (अनुभव दर्शन) every week

अतिथि देवो भवः

has international quality facilities, with a team of

108+108

well trained young Rajasthani staff to look after the guests

108 minutes

Light and Sound Laser show on (काल गणना) daily at 8pm



108 minutes

Yoga & Meditation in Herbal Gardens (औषधीय नक्षत्र वाटिका) before Sunrise



108 minutes

Bhajan BonFire in Winter Nights



18 minutes

Geeta Paath | Rain Dance in Summer noon
Splash in Swimming Pool | Horse Riding
Camel Riding | Colourful Dance by 18 girls
Helicopter Ride of 108 Villages



has a

- Helipad
- sufficient Car Parking Space with e-Charging facilities,
- Banquet Hall
- 18 Guest Rooms
- Restaurant
- Swimming Pool
- Rain Water Harvesting
- Solar Power System.

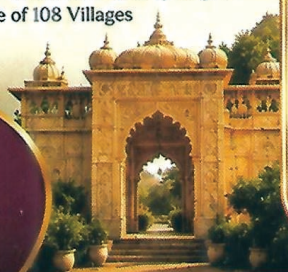

Chatarpura,
Kotputli, Rajasthan
(near Sariska Wildlife Sanctuary)

99037 18791

oprawat108@gmail.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৯ বর্ষ ৯ সংখ্যা, ২৯ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

১৬ নভেম্বর - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com



সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

দুর্জনদের নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে দিতে পারলেই জনগণের প্রতি প্রতিশ্রুতি পালন হবে : 'আইনের শাসন' ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

শাপমোচন দেখুন দিদি ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

রাজনৈতিক শিষ্টাচার বর্জন করে ব্যক্তি আক্রমণ কাম্য নয় ☐ মণীন্দ্রনাথ সাহা ☐ ৮

বিজ্ঞানী ড. অশোক সেন, কিছু কথা, কিছু স্মৃতি ☐ হরিনাথ নন্দ ☐ ১০

কমিউনিস্টদের বুকস্টলের আসল উদ্দেশ্য হিন্দু ও হিন্দুধর্মের অপপ্রচার ☐ স্বরূপ কুমার ধবল ☐ ১১

২০২৬ সালের অস্কার ক্লেইন পদকজয়ী বিজ্ঞানী ড. অশোক সেন ☐ ড. গৌরাঙ্গ দুয়ারী ☐ ১৩

একটি স্ট্রিং ধরে মহাবিশ্বের খোঁজে—ড. অশোক সেনের অসাধারণ বৈজ্ঞানিক যাত্রা ☐ ড. সোমনাথ গড়াই ☐ ১৬

ভারতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-তে অনুসৃত পঞ্চকোষ পদ্ধতি এবং পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানবদর্শন ☐ ড. বিশ্বরূপ ঘটক ☐ ১৮

ক্ষণস্থায়ী সুবিধার জন্য প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহার দীর্ঘস্থায়ী বিপদ ডেকে আসছে ☐ সঞ্জিত কুমার সাহা ☐ ১৯

জগৎ ধারিণী জগদ্ধাত্রী ☐ নন্দলাল ভট্টাচার্য ☐ ৩১

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী কথা ☐ গোপাল চক্রবর্তী ☐ ৩৭

দিশাহীন পশুপালন নীতি ☐ ড. সর্বস্বরূপ ঘোষ ☐ ৩৫

মহাবিশ্বের সুর ও ড. অশোক সেন : তারতত্ত্বের গোলকধাঁধায় ভারতের আলোর দিশারি ☐ ড. অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ৪৩

বাংলাদেশে পূজায় মন্দিরের সামনে গোমাংস ভক্ষণ—ইসলামি জেহাদিরা কী নতুন বার্তা দিল? ☐ বিশেষ প্রতিনিধি ☐ ৪৬

কাশ্মীর ভ্রমণ— ৩৭০ ধারা বিলোপের আগে ও পরে ☐ খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ☐ ৪৮

নিয়মিত বিভাগ :

☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ সমাবেশ সমাচার : ২৩-৩০ ☐ খেলা : ৩৯ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৫০

প্রকাশিত হবে
২৩ নভেম্বর
২০২৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৩ নভেম্বর
২০২৬

ভারতীয় জাতীয়তাবোধের পুরোধাপুরুষ

ঊনবিংশ শতকে বঙ্গীয় নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী তথা ভারতীয় জাতীয়তাবোধের অন্যতম পুরোধাপুরুষ রাজনারায়ণ বসু। তিনি ভারতীয় জাতীয়তার পিতামহ নামে পরিচিত। স্বদেশী ও আত্মনির্ভর ভারত গঠনের এই প্রেরণাপুরুষের জন্মের দুশো বছর চলছে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ঊনআশিতম বর্ষ পূর্ণ করল। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ভারতের গর্ব বিজ্ঞানী ড. অশোক সেন

ঋগ্বেদ 'ঋত' বা শাশ্বত শৃঙ্খলাকে মহাবিশ্বব্যাপী ভৌত শক্তি ও প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণকারী মৌলিক, মহাজাগতিক ও নৈতিক বিধান হিসাবে বর্ণনা করিয়াছে। বৈদিক ষড়দর্শনের অন্তর্গত বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শন অনুসারে যাবতীয় ভৌত বাস্তবতা 'পঞ্চভূত' অর্থাৎ পাঁচটি মৌলিক অবস্থা বা উপাদান হইতে উদ্ভূত— পৃথিবী (ক্ষিতি/মাটি), অপ (জল), তেজ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু) ও ব্যোম (আকাশ/মহাকাশ)। মহর্ষি কণাদ প্রণীত 'বৈশেষিক দর্শন'-আধারিত চিন্তাধারা পরাণুতত্ত্ব বা পরমাণুতত্ত্বের একটি প্রাথমিক রূপ উপস্থাপন-পূর্বক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, জড় পদার্থ— 'পরমাণু' নামক অবিভাজ্য, শাশ্বত কণা দ্বারা গঠিত, যাহা বিভিন্ন শক্তির প্রভাবে একত্রিত হয়। ঋগ্বেদোক্ত 'নাসদীয় সূক্ত'-এর ন্যায় স্তোত্রসমূহে— মহাবিশ্বের উৎপত্তি, মহাবিশ্ব সৃষ্টির পূর্বের শূন্যতা এবং একটি একীভূত উৎস হইতে কী প্রকারে সমগ্র মহাবিশ্বের অস্তিত্বের সূচনা হইয়াছিল সেই সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা সূত্রাবলী বিষয় আলোচিত হইয়াছে। বৈদিক ভৌতদর্শনের আধুনিক ব্যাখ্যাক্রমে অদ্বৈত তত্ত্ব, বিশ্বজনীন স্পন্দন বা ওঙ্কার ধ্বনি, মহাকর্ষের প্রভাবে প্রতিটি উপাদানের মহাবিশ্বজনীন আন্তঃসংযুক্তি ইত্যাদির সহিত ভর ও শক্তির আন্তঃপরিবর্তন-জনিত 'বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব', কোয়ান্টাম এনট্যাঙ্গলমেন্ট ও তরঙ্গকণা দ্বৈততা (ওয়েভ পার্টিক্‌ল্ ডুয়ালিটি) সূত্রের ন্যায় আধুনিক তত্ত্বাদির ধারণাগত সাদৃশ্য উপস্থাপিত হইয়া থাকে। উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় মুনি-ঋষি প্রমুখ প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাবিদগণ পদার্থবিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রে উন্নত অবদান রাখিয়াছিলেন। শূন্যের আবিষ্কার, দশমিক পদ্ধতি, প্রাথমিক বীজগণিত ও শুল্বসূত্রের জ্যামিতিক ও ত্রিকোণমিতিক নিয়মাবলীকে একটি পরীক্ষামূলক, ব্যবহারিক গাণিতিক শাখা হিসাবে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান— বর্তমান সময়ে বিকশিত 'নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষণ' (কন্ট্রোল্ড এক্সপেরিমেন্টেশন) ও 'পরিমাণগত মডেলিং' (কোয়ান্টিটেটিভ মডেলিং)-এর উপর নির্ভর করিয়া স্বীকৃতিদান করে।

সাম্প্রতিক সময়েও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে ভারতীয় মনীষার জয়যাত্রা অব্যাহত রহিয়াছে। স্বীয় প্রতিভা ও বিজ্ঞান সাধনার বলে আন্তর্জাতিক স্তরে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি ও খ্যাতি ভারতীয় বিজ্ঞানীগণ অর্জন করিয়াছেন। গত ২২ অক্টোবর তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী ড. অশোক সেন পদার্থবিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ গবেষণা ও অবদানের স্বীকৃতি-স্বরূপ স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয় ও 'দ্য নোবেল কমিটি ফর ফিজিক্স' কর্তৃক 'অস্কার ক্লেইন পদক' সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন। প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁহার এই পদকপ্রাপ্তি। ইহার সহিত তিনি 'অস্কার ক্লেইন স্মারক বক্তৃতা' দান করেন। ড. অশোক সেন 'স্ট্রিং তত্ত্ব' বিষয়ে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিয়াছেন; তাঁহার সবল-দুর্বল দ্বৈততা (এস-ডুয়ালিটি) সম্পর্কিত গবেষণাপত্রটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। স্ট্রিং তত্ত্বানুযায়ী মুক্ত স্ট্রিং বা সূত্রাসমূহের প্রান্তবিন্দু যেস্থানে আসিয়া শেষ হয় এবং ডিরিক্লে সীমানা শর্তানুসারে একটি নির্দিষ্ট স্থানে আটকাইয়া থাকে, সেই ত্রিমাত্রিক বা বহুমাত্রিক তল বা পর্দাকে 'ডিরিক্লে মেমব্রেন' (সংক্ষেপে ডি-ব্রেন) বলা হয়। অস্থির ডি-ব্রেনসমূহের অধ্যয়নের বিষয়ে ড. সেন অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং এই জাতীয় পর্দাসমূহে 'উন্মুক্ত স্ট্রিং ট্যাকিয়ন কনডেন্সেশন' সম্পর্কে বিখ্যাত 'সেন অনুমান'-শীর্ষক এক তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তিনি 'স্ট্রিং ক্ষেত্র তত্ত্ব'-সম্পর্কিত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্র রচনা করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণামূলক অবদানসমূহের মধ্যে রহিয়াছে— কৃষ্ণগহ্বরের জন্য এনট্রপি ক্রিয়ার আনুষ্ঠানিকতা, কোয়ান্টাম মহাকর্ষ ক্রিয়া-সম্পর্কে আলোকপাত ও কৃষ্ণগহ্বরের মাইক্রোস্টেটসমূহের যথাযথ গণনা। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ড. মেঘনাদ সাহার ন্যায় বরেণ্য ভারতীয় বিজ্ঞানীদিগের সার্থক উত্তরসূরী অধ্যাপক ড. অশোক সেন সমগ্র ভারতের গর্ব।

সুভাষিতম্

ন বিদ্যয়া বিনা সৌখ্যং নরাণাং জায়তে ধ্রুবম্।
অত ধর্মার্থ মোক্ষেভ্যো বিদ্যাভ্যসং সমাচরেৎ।।

অর্থ ঃ বিদ্যা বিনা মানুষের সুখ প্রাপ্ত হয় না। এজন্য ধর্ম অর্থ ও মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য বিদ্যার্জন করা প্রয়োজন।

দুর্জনদের নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে দিতে পারলেই জনগণের প্রতি প্রতিশ্রুতি পালন হবে

‘আইনের শাসন’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

কলকাতা আর হাওড়া পুরনিগম-সহ সাত পৌরসভার ভোট নিয়ে বিস্তর জলঘোলা করছে বিরোধীরা। যদিও তারা জানে বিরোধিতা টিকবে না। ভারতীয় জনতা পার্টির রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এই মুহূর্তে এরাজ্যে নেই। তাই ভারতীয় জনতা পার্টিকে আটকাতে মিটিং-মিছিল আর রাজনৈতিক জনসভা না করে আদালতে বিভিন্ন ফন্দিফিকিরের মামলা এঁটে ভোট পিছানোর চেষ্টা করছে বিরোধীরা।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে বা জানুয়ারিতে এই ভোট হতে পারে। রাজনৈতিক দল হিসেবে বিদেশি বামেরা আর তস্কর পার্টি এখন ছায়ায় পরিণত হয়েছে। সবেধন নীলমণি একটি মাত্র বিধায়ক নিয়ে বিদেশি বামেরা বিধানসভায় জায়গা পেয়েছে। তস্কর দল ভেঙে খান খান হয়ে যাওয়ার পর বিরোধী অবস্থান আরও ঢিলে হয়ে পড়েছে।

এটা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়। তস্কর দল ২০২৬-এর রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে যে ৪১ শতাংশ ভোট পেয়েছিল তার বড়ো কারণ তাদের যারা ভোট দিয়েছিল ভয়-ভীতি থেকেই তারা তা করেছিল। ভোটের সময় তস্কর বাহিনী এই ভোটারদের বুঝিয়েছিল যে তারাই ক্ষমতায় আসছে। পাশার দান যে উলটে রয়েছে তারা তা বোঝেনি। বিদেশি বামেরা নিজেদের অবস্থান ঠিক করতে পারছে না।

এর মধ্যে বৃদ্ধ বিমান বসু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর শিল্প আর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এটা সহজেই বলা যায় প্রায় বিরোধীহীন রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির অনায়াস জয় ও অগ্রগতি এই মুহূর্তে আটকানো প্রায় অসম্ভব। দেশের ২২টি রাজ্যে শাসক দল ভারতীয় জনতা পার্টি। পশ্চিমবঙ্গ তার অংশ। যদিও গত ৪৯ বছরে নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসের কারণে পিছিয়ে পড়া এই রাজ্যকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উন্নয়নের ট্র্যাকে ফিরিয়ে আনার ভাবনায় বদ্ধপরিকর ভারতীয় জনতা পার্টি। বিশেষত রাহুল গান্ধীর কংগ্রেস যখন বারবার তাদের নিজেদের বোকামি ফলাও করে প্রকাশ করে ফেলেছে।

তস্কর দলের সমর্থকদের ইদানীং আদালতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে শুনি। অথচ তাদের নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সেই আদালতে অজস্র বার মামলা করে কোটি কোটি টাকা খরচ করেছেন রাজ্যের কোষাগার শূন্য করে। জনগণের করের টাকা আর সরকারের নিজস্ব আয় যে মূর্খের মতো খরচ করা যায় তস্কর দল পরিচালিত সরকার তাই প্রমাণ করেছে। গত মে মাসে ভোটে হেরে যাওয়ার পর থেকে তাদের নেতা-মন্ত্রীরা রাজ্য পুলিশ বা কেন্দ্রীয় এজেন্সির হাতে ধরা পড়ছে। এ ঘটনা নজিরবিহীন! কোনো রাজ্যে সরকার ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার ৬ মাস পরেও সেই সরকারের চোর নেতা আর মন্ত্রী ধরা পড়ছে ভারতীয় রাজনীতিতে এ বিরল ঘটনা।

কিছুদিন আগেই সেই দলের প্রথম সারির এক নেতা আর সেনাপতি মূর্খের মতো দাবি করেছেন তাদের দল নাকি সর্বোচ্চ আদালতের জন্য ভোটে হেরেছে। নির্বাচন কমিশন বা কমিশনারের জন্য নয়। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর— তস্কর দলের প্রতীক তাদের ভাঙা পার্টি পেতে চলেছে। তাই তস্কর দলের এখন অবস্থা— মুণ্ডু গেলে খাবটা কীভাবে? তাই মূর্খের ক্রোধ। ক্ষোভ প্রকাশের এটাই রাস্তা। নাটুকেপনা করতে তাই রাস্তা দখল করে তস্কর নেতার জন্মদিন পালন হয়। আর তা নিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাঁধে। রাজনৈতিক ইতিহাস বলে বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পালনের জন্য জনগণকে অপেক্ষায় রাখা যেমন অপরাধ, সমান অপরাধ তা নিয়ে বারবার আস্ফালন করা। তস্কর দল পরিচালিত সরকার তাই করত। শিল্পনীতি থেকে শুরু করে জমিনীতি সব ক্ষেত্রে তারা তাদের ব্যর্থতার নজির রেখে গিয়েছে। রাজ্যের নতুন সরকার সে বিষয়ে সতর্ক। তাই প্রতিশ্রুতি আর পালন যে সমার্থক— সেটা তারা জানে।

যতদূর জানা যায়— তস্কর সেনাপতির গ্রেপ্তার বা আটক এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা। বড়ো মাছ মাত্রেই জাল কেটে বেরোতে চায়। তাই ধৈর্য ধরতে হবেই। মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা, করুণানিধি, কেজরিওয়াল, হেমন্ত সোরেন বা লালু যাদব তা পারেনি। পরে রেহাই পেলেও শ্রীঘর তাদের ঘুরতে হয়েছে।

মূর্খেরা আস্ফালন করবেই আর তা স্পর্ধা ছাড়িয়ে করবে। এখন পর্যন্ত তস্কর দল পরিচালিত সরকারের ৩৭ জন নেতা-মন্ত্রী আটক বা গ্রেপ্তার হয়েছে। কেউ আবার জামিন পেয়েছে।

এরাজ্যে গণতন্ত্রের সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হলে অন্যান্য শত্রু রাজ্যের থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে একটু আলাদা ভাবে চলতেই হবে। এটা সত্য যে, রাজনৈতিক প্রয়োজনে দুর্জনদের প্রশাসনের অংশ করলে অতি শক্তিশালী শাসনব্যবস্থাও ভেঙে পড়ে। দুর্জনদের আস্ফালন আর ক্রোধ নেভাতে হবে। তাদের জন্য নির্ধারিত যে সঠিক স্থান সেখানেই তাদের পৌঁছে দিতে হবে আর তাহলেই এরাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

শাপমোচন দেখুন দিদি

অভিশপ্তেষু দিদি,

সিঙ্গুরে ফিরছে শিল্প। হবে গাড়ি কারখানাই। নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আর তার মধ্যে বড়ো ঘোষণাটাই সিঙ্গুরে শিল্প ফেরানো। সিঙ্গুর থেকে টাটাকে ফিরিয়ে দিয়ে দেশের শিল্পপতিদের কাছে পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছিলেন। সেটার পাপস্খালন হচ্ছে। শাপমোচনও বলতে পারেন দিদি।

সেই যে দিদি ২০০৬ সাল। সিঙ্গুরে শিল্প গড়তে উদ্যোগী হয়েছিলেন তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। টাটা গোষ্ঠীর 'ন্যানো' প্রকল্পের হাত ধরে সেই শিল্পায়নের সূচনা হতে পারত। কিন্তু তিনি ভুলভাল করেছিলেন জমি অধিগ্রহণের কাজে। ব্যাস, সুযোগ পেয়ে আপনি যা খুশি করে শেষপর্যন্ত সিঙ্গুর থেকে তাড়িয়েছিলেন টাটা গোষ্ঠীকে। ক্ষমতায় এসে সিঙ্গুরের মাটিতে সর্ষে বীজ ছড়িয়েছিলেন, সিঙ্গুর আন্দোলনকে স্কুল পাঠ্য ইতিহাস বানিয়েছিলেন কিন্তু শিল্প তাড়ালেও কৃষিও হয়নি ওই জমিতে।

এবার জমি অধিগ্রহণের নতুন নীতি নিয়েছে নতুন সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস, বামফ্রন্ট জমানার মতো জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে কৃষকদের রক্ত ঝরবে না। তিনি জানিয়েছেন, 'সিঙ্গুরে আমরা কিছু একটা করবই। নামি বাণিজ্যিক ভারী গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থা অশোক লেল্যান্ডের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে কথাও হয়েছে।'

এর পরেও একটা কথা আছে। নতুন শিল্পনীতিতে শুধু মৌ স্বাক্ষর করে লোকদেখানো চমক থাকছে না। আপনার সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন করত। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। কথা দিয়েও সৌরভ কথা রাখেননি। এমন অনেক আছে। নতুন সরকার সেই রাস্তায় হাঁটবে না।

একটি ন্যানো কারখানা চলে গিয়েছিল। কিন্তু তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি, রাজনীতি ও শিল্পায়ন নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, তা আজও শেষ হয়নি। সিঙ্গুর তাই শুধু একটি হারিয়ে যাওয়া কারখানার নাম নয় দিদি। সিঙ্গুর পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের ইতিহাসে এক বড়ো প্রশ্নচিহ্ন।

১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর বামফ্রন্ট সরকার ভূমি সংস্কারের উপর জোর দেয়। এরপর আসে অপারেশন বর্গা। আর উলটো পথে হেঁটে ২০০৬ সালে টাটা মোটরসের ন্যানো কারখানার জন্য হুগলীর সিঙ্গুরে প্রায় ৯৯৭ একর কৃষি জমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ নেয় বামফ্রন্ট সরকার। নন্দীগ্রামে আরও বড়ো বিতর্ক। যে বামফ্রন্ট সরকার একসময় কৃষকের জমি অধিগ্রহণে মরিয়া হয়ে উঠেছিল, বুঝেছিল কৃষির পাশাপাশি শিল্পও জরুরি, শিল্প না বাড়লে কর্মসংস্থান ও অর্থনীতির বিকাশ সম্ভব নয়। নতুন স্লোগান তৈরি হলো, কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ। কিন্তু ততদিনে আপনি এসে গেছেন। বামেরা পশ্চিমবঙ্গকে শিল্পহীন বানানোর পাপস্খালন করতে পারল না।

২০১১ সালে আপনি ক্ষমতায় আসার পর জমি অধিগ্রহণের নীতি বদলানোর কারণে একাধিক শিল্পপ্রকল্প ও শিল্পপার্কের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। এক ডজনেরও বেশি শিল্পপার্ক আটকে যায়। ওই প্রকল্পগুলিতে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা।

সিঙ্গুরে টাটার ন্যানো কারখানা চলে যাওয়ার পর আপনি বলেছিলেন, কৃষকের জমি জোর করে নেওয়া হবে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কৃষকের জমি রক্ষা করতে গিয়ে রাজ্যের শিল্পের জন্য জমির বিকল্প ব্যবস্থা কি তৈরি করা গিয়েছিল? সিঙ্গুরের পরেও রাজ্যের শিল্পায়নের পথে জমিই বড়ো বাধা হয়ে রইল। এবার দিন বদল।

নতুন শিল্পনীতির রূপরেখা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিলবে বিশেষ সুবিধা। বড়ো শিল্পের জন্য আলাদা প্যাকেজ ঘোষণা করে সংস্থাগুলিকে ১২০ শতাংশ পর্যন্ত সহায়তা দেওয়া হবে। মহিলা কর্মীদের কর্মসংস্থানে অতিরিক্ত সুবিধা। প্রয়োজনে কর্মরত মহিলাদের হস্টেল তৈরিতে অনুদান দেবে রাজ্য। উৎপাদনকারী ইউনিটগুলির জন্য এসজিএসটি-র ক্ষেত্রেও আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আগের সরকারের আমলে চিত্তরঞ্জন ও হলদিয়া শিল্পাঞ্চল সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে আর সিন্ডিকেট বা তোলাবাজি চলবে না। সঙ্কল্পপত্রে দেওয়া প্রতিটি প্রতিশ্রুতি পালন হবে।'

নতুন নীতিতে হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সুবিধা এবং ১০০ শতাংশ পর্যন্ত স্ট্যাম্প ডিউটি ছাড়ের কথা বলা হয়েছে। ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ ও পরিষেবা ক্ষেত্র— সব ধরনের শিল্পকেই এই সহায়তার আওতায় আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অনগ্রসর এলাকায় কারখানা গড়লে মিলবে অতিরিক্ত উৎসাহ ভাতা। গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে রুগ্ন ও বন্ধ শিল্প পুনরুজ্জীবন, সবুজ বিদ্যুৎ এবং গবেষণা-উন্নয়নমূলক কাজকে। তবে আসল কাজটা কিন্তু সিঙ্গুরে। লজ্জা মোছাই বড়ো কাজ। এটা হলেই তো শিল্পপতিদের কাছে রাজ্যের ইমেজ ফিরবে। সুদিন আসবে।

আপনি শুধু দেখতে থাকুন দিদি। একটুও যদি বাধা দিতে আসেন, যদিও সে ক্ষমতা নেই, মুখেও যদি কিছু বলেন, আমি বলে রাখছি দিদি, তার পরিণাম আরও ভয়ঙ্কর হবে। এই রাজ্যের মানুষ কিন্তু আপনাকে হারিয়েও শান্তি পায়নি। □

রাজনৈতিক শিষ্টাচার বর্জন করে ব্যক্তি আক্রমণ কাম্য নয়

রাজনৈতিকভাবে সুবিধা করতে না পেরে কংগ্রেস নেতারা শালীনতার সীমা অতিক্রম করে উলটোপালটা মন্তব্য করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উদ্দেশ্য করে।

মণীন্দ্রনাথ সাহা

গণতন্ত্রে বিরোধী দলের ভূমিকা অপরিসীম। নির্বাচিত সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করে জনমত গঠন করে সরকারকে চাপে রাখাই বিরোধীদের প্রথম রাজনৈতিক কৌশল। রাজনীতিতে হার-জিৎ থাকতেই পারে। তবে প্রত্যেক পরাজয় থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যাওয়াই রাজনীতি। আগে ভারতীয় রাজনীতিতে আমরা দেখেছি, পরাজিত দলের নেতা নিজের পরাজয় মেনে নিয়ে জনগণের ভোটে নির্বাচিত দলকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। বলেছেন, তাঁরা নিজেদের পরাজয়ের কারণ ময়নাতদন্ত করে দেখবেন।

অথচ এখন দেখা যাচ্ছে, একের পর এক নির্বাচনে হেরে শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেস দল আজ চূড়ান্ত হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে তাদের নেতাদের মাথা গরম হয়ে রাজনৈতিক শিষ্টাচারকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে ব্যক্তি আক্রমণে মেতে উঠেছে। তাতে যে তাদের কতবড়ো রাজনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে তা তাঁরা একবারও ভেবে দেখছেন না। রাজনৈতিকভাবে সুবিধা করতে না পেরে কংগ্রেস নেতারা শালীনতার সীমা অতিক্রম করে উলটোপালটা মন্তব্য করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উদ্দেশ্য করে। এমনকী নরেন্দ্র মোদীর পদবি থেকে মা-বাবা পর্যন্ত তুলে গালি দিচ্ছেন।

দিন কয়েক আগে পাটনায় আয়োজিত এক সভায় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে তাঁর বক্তৃতায় যেভাবে নরেন্দ্র মোদীর বাবা-মাকে টেনে এনেছেন, তা অত্যন্ত কুরুচিকর এতে কোনো সন্দেহ নেই। ওই সভায় খাড়্গে নরেন্দ্র মোদীকে নিশানা করে 'তাঁকে যেতেই হবে' বলেছিলেন। সেই সভায় উপস্থিত এক ব্যক্তি তার জবাবে বলেছিলেন, 'মোদীজী কোথাও যাবেন না।' সেকথা শুনে মেজাজ হারিয়ে খাড়্গে বলেছিলেন, 'মোদী বিদায় নেবে, মোদীর বাপ বিদায় নেবে, মোদীর মা বিদায় নেবে।' খাড়্গের এই মন্তব্যের পর দেশজুড়ে খাড়্গে এবং কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। কেউ বলছিল খাড়্গের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় সে কেমন বাবা-মার সন্তান। কেউ বলেছেন, কতটা ছোটোলোক হলে এমন কথা বলা যায়? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে খাড়্গের মন্তব্যের পর উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের পুরনো একটা মন্তব্য আবারও আলোচনায় উঠে এসেছে।

আদিত্যনাথ বলেছিলেন—'খাড়্গেজী, আমার উপর রাগ করবেন না। যদি রাগ করতেই হয়, তবে হায়দরাবাদের নিজাম, সেই রাজাকারদের উপর রাগ করুন, যারা আপনার গ্রাস পুড়িয়েছে, হিন্দুদের হত্যা করেছে এবং আপনার শ্রদ্ধেয়া মা, বোন ও পরিবারের সদস্যদের নৃশংসভাবে পুড়িয়ে মেরেছে। আপনি ভোটব্যাংকের জন্য এই সত্যটি জাতির সামনে প্রকাশ করতে অবহেলা করছেন। এটা দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। আমি একজন যোগী, আমি কেবল একটিই জিনিস শিখেছি, সবকিছু দেশের জন্য হওয়া উচিত।' যোগীজী সত্য কথা বলেছেন। দেশের বিজেপি বিরোধী রাজনীতিকরা শুধুমাত্র পনেরো শতাংশ মুসলমানদের ভোট পাওয়ার জন্য তারা বিজেপি তথা নরেন্দ্র মোদীর বিরোধিতা, হিন্দু সমাজ এবং তাদের উপাস্য দেব-দেবীর বিরোধিতা এমনকী দেশের বিরোধিতা করতেও তারা দ্বিধা করছে না।

শুধু এবারই নয়, এর আগেও কংগ্রেসের সভা থেকে নরেন্দ্র মোদীর মাকে নিয়ে কটূক্তি করা হয়েছে এবং তাঁর স্ত্রীকে নিয়েও কুরুচিকর মন্তব্য করা হয়েছে। একবার গুজরাট বিধানসভার নির্বাচনী প্রচারে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী নরেন্দ্র মোদীকে 'মৌত কা সওদাগর' বলেছিলেন। তা নিয়েও যথেষ্ট শোরগোল হয়েছিল। তারপরেও সেই নরেন্দ্র মোদী সেবার যেমন ভোটে জিতে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন, তেমনই পরে প্রথমবার লোকসভা ভোটে নিজেকে এবং দলকে জিতিয়ে এনে নিজে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন।

কর্ণাটকের নির্বাচনী প্রচারে রাহুল গান্ধী বলেছিলেন, 'সব চোরের পদবি কেন মোদী

হয়?' এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে মামলায় সুরাটের আদালত রাহুলকে দু'বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিল এবং তার সাংসদ পদও খারিজ হয়েছিল। পরে উচ্চ আদালতের রায়ে তিনি সাংসদ পদ ফিরে পান। 'অশুভ সম্পর্ক' নিয়ে মন্তব্য করলেও তার কোনো প্রমাণ তিনি দিতে পারেননি। ২০১৯ সালের লোকসভার নির্বাচনী প্রচারে বিনা প্রমাণে মোদীকে উদ্দেশ্য করে 'চৌকিদার চোর হ্যায়' স্লোগান দেওয়ায় রাহুলকে সতর্ক করেছিল শীর্ষ আদালত। তবুও লজ্জা হয়নি এই 'পাপ্পু' (জনগণের ভাষায়) রাজনীতিকের এবং তার দলের সভাপতি খাড়গের।

শুধু কি কংগ্রেসের নেতা-নেত্রীরাই নরেন্দ্র মোদী সম্পর্কে কুকথা বলছেন? তা তো নয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ২০১৪ সালে লোকসভা ভোটের প্রচারে বিজেপি দলের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন— 'তুই কে, তুমি কে ভাই? আমি ইচ্ছা করলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে হেলিকপ্টার নামিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরাতে পারি। একটা দাঙ্গাবাজ।'

সত্যি ভাবতে অবাক লাগে এই ভেবে যে, বিজেপি বিরোধী রাজনীতিকরা মুসলমানদের ভোট পাওয়ার জন্য যেভাবে তারা বিজেপির বিরোধিতা করতে গিয়ে দেশের গরিষ্ঠ হিন্দু সমাজ এবং দেশেরও বিরোধিতা শুরু করেছে, তা তারা নিজেরাই জানে না। অথচ ভারতের রাজনীতি এরকম ছিল না। যেমন একসময়ে দিল্লির মসনদে কেমন হাস্যকর পরিবেশ ছিল তার ছোট্ট একটা নমুনা জানা যাক। প্রবীণ সাংসদ আচার্য কৃপালনী তখন বিরোধী নেতা। আর তাঁর স্ত্রী কংগ্রেস বেঞ্চে। কংগ্রেস সরকারকে প্রবীণ সাংসদ প্রচণ্ড সমালোচনা করছিলেন। তখন এক কংগ্রেস সদস্য উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠেন— 'আপনার স্ত্রী কিন্তু এখন আমাদের দিকে। মনে রাখবেন আপনি তাঁকেও আক্রমণ করছেন।' আচার্য কৃপালনী নিজেও দীর্ঘদিন কংগ্রেসে ছিলেন, এমনকী কংগ্রেস সভাপতিও হয়েছিলেন। তিনি তখন হাসতে হাসতে বলে উঠেন— 'এতদিন জানতাম কংগ্রেস সদস্যরা বোকা, এখন তো দেখছি তারা গ্যাংস্টার। তারা অন্যের বউকে পর্যন্ত উঠিয়ে নিয়ে যায়।' গোটা সংসদে তখন হাসির রোল ওঠে। এছাড়া ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়কে মূল্য বৃদ্ধির জন্য সংসদে তাঁর টেবিলের উপর পেঁয়াজ রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন এবং পঞ্জাবের নিরাপত্তাজনিত ব্যর্থতার জন্য চুড়ি রেখে দিয়ে গিয়েছিল।

২০০৪ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকারের পতন এবং কংগ্রেস সরকারের উত্থানের পর বাজপেয়ীজী এবং সদ্য শপথ নেওয়া প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের সৌজন্যে সাক্ষাৎ এবং আলাপ দেশবাসীকে মুগ্ধ করেছিল।

যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনে সিপিএমের বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পরিচালিত সরকারের পতন হয় এবং তৃণমূল ক্ষমতায় আসে, সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে বিমান বসু এবং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য রাজনৈতিক সৌজন্য বজায় রেখে মমতার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন ২০১১ সালে। অথচ ২০১৪ সালে কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতায় এলে বিজেপির আমন্ত্রণে নরেন্দ্র মোদীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মমতা রাজনৈতিক সৌজন্য বজায় রাখতে পারেননি এবং তিনি ওই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যাননি। আবার এবারের ভোটে রাজ্যে বিজেপির জয়ের পর শুভেন্দু অধিকারীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও মমতা সেখানে উপস্থিত হননি। বরং আরও কটু মন্তব্য করেছেন। এইখানেই সভ্যতা-ভব্যতার পরিচয় মেলে।

২০২৪ সালে ওড়িশা বিধানসভা ভোটে ওই রাজ্যের দীর্ঘদিনের অত্যন্ত জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের দল বিজেপির কাছে পরাজিত হয়। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বিজেপির আমন্ত্রণে নবীন পট্টনায়ক সেখানে উপস্থিত হলে মুখ্যমন্ত্রীপদে শপথ নিতে যাওয়ার আগে মোহন চরণ মাঝি নবীনবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে তাঁকে সসম্মানে ধরে নিয়ে এসে মঞ্চে সামনের সারিতে বসিয়ে দেন। এই যে রাজনৈতিক সৌজন্য, তার মূল্য নিরূপণ করা যায় না।

মুসলমানদের ভোটের লোভে নরেন্দ্র মোদীর বাবা-মাকে টেনে আনা মল্লিকার্জুন খাড়গের মন্তব্য ২০২৯ সালের লোকসভা ভোটে বা আগামী বছর পাঁচ রাজ্যের ভোটে কংগ্রেস তথা ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে কতটা ফলপ্রসু হবে সেটা অনুমান করা না গেলেও ওই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে ওইসব ভোটে নরেন্দ্র মোদী যে ঝড় তুলবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই বলেই অনেকের অভিমত। আর সেই ঝড়ে রাজনৈতিক শিষ্টাচার বর্জিত কংগ্রেস তথা ইন্ডি জোটের পরিস্থিতি কেমন হবে বা বিজেপি দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নরেন্দ্র মোদী চতুর্থবারের জন্য স্বমহিমায় প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসে দেশকে নেতৃত্ব দেবেন কিনা তা সময়ই বলবে। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক দেশ এই ভারতের জনগণই শেষ কথা বলে থাকেন, কোনো বালখিল্য রাজনীতিক বা আরশোলা, টিকটিকি বা ছারপোকা, ইঁদুর, ছুঁচো নয়। গণতন্ত্রের প্রহরী দেশের সেই জনগণ আগামীদিনের ভোট যুদ্ধে কার গলায় বরমাল্য পরিয়ে বরণ করে নেবেন, সেটাই এখন দেখার।

শোকসংবাদ



ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলার বীরেন্দ্র কিশোর এবং যাদবপুর নগরের বৌদ্ধিক প্রমুখ অশোক দাস ও অসিত দাসের পিতৃদেব প্রমোদচন্দ্র দাস গত ১৩ অক্টোবর কলকাতার গল্ফগ্রিনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স বয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

বিজ্ঞানী ড. অশোক সেন, কিছু কথা, কিছু স্মৃতি

হরিনাথ নন্দ

উত্তর কলকাতার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা ও পরবর্তীকালে বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এমন কিছু মহান মানুষের সঙ্গে পরিচিত ও কিছুটা ঘনিষ্ঠ হবার বিরল সৌভাগ্য আমার হয়েছে যার স্মৃতিচারণ আজ আমার অবসর যাপনের এক মধুর অভিজ্ঞতা। ল্যাটিন শব্দবন্ধ Alma Mater, যার ইংরেজি অর্থ Nourishing/Fostering/Kind Mother। বাংলায় লালনকারী মা আমরা বলতে পারি। গত একশো বছরে বাংলামাধ্যম এই বিদ্যালয়টি শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মায়ের স্মৃতি বিজড়িত শ্যামপুকুর বাটির অতি সন্নিকটে অবস্থানের কারণে কিনা জানি না, এক রত্নগর্ভা জননী-স্বরূপা প্রকৃত অর্থে স্নেহময়ী ও লালনকারী Alma Mater হয়ে উঠেছে। যাঁর উদ্যোগে ও বলিষ্ঠ অভিভাবকত্বে এই বিদ্যালয়টি একসময় পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় হয়ে উঠেছিল, তিনি এক নিবেদিতপ্রাণ আচার্য, এই বঙ্গের প্রথম জাতীয় শিক্ষক জ্যোতির্বিকাশ মিত্র; তাঁর অগণিত কৃতি ছাত্র সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী , রাজ্যপাল ও প্রধান বিচারপতিও হয়েছেন। এই বিদ্যালয় দেশকে সাহিত্যিক, শিল্পী, অভিনেতা, নাট্যকার, সাংবাদিক, টেস্ট ক্রিকেটার, ফুটবলার, গ্র্যান্ড মাস্টার, চিকিৎসক ও বিশ্বসেরা বিজ্ঞানী উপহার দিয়েছে। বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের সময় (২০১৯-২০) অধ্যাপক ও পদার্থবিজ্ঞানী অশোক সেনের বেশকিছু সহপাঠী ও পুরনো বন্ধুর সংস্পর্শে আসার সুযোগ আমার হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন আলাপচারিতা এবং পরে অনুষ্ঠানের দিন পদযাত্রায় ড. সেনের স্বভাবসারল্য ও মাটির কাছাকাছি অবস্থানের পরিচয় পেয়ে বারবার মুগ্ধ হয়েছি। মানুষটি মঞ্চে একদম স্বচ্ছন্দ অনুভব করেন না। দেখেছি মঞ্চ থেকে নেমে এসে কীভাবে ছোটো ছোটো শিশুদের সঙ্গে তিনি অনায়াসে মিশে গেলেন। তখন বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিল প্রখ্যাত বিজ্ঞানী প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. এপিজে আব্দুল কালামের কথা, তিনি যেখানেই যেতেন, সেখানে ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে যেতেন। এতো বিশ্বজোড়া যাঁর খ্যাতি, তাঁর তুলনা একমাত্র উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্কাইলার্ক-এর সঙ্গে করা যেতে পারে। স্কাইলার্ক পাখিটি সুউচ্চ আকাশের বুকে ভেসে বেড়ালেও, তার মন পড়ে থাকে এই মাটির বুকে যেখানে তার বাসাটি রয়েছে। কবি একে বলেছেন— Type of the wise who soar, but never roam; True to the kindred points of Heaven and Home (জ্ঞানী মানুষের প্রতীক, যে আকাশে ডানা মেলে কিন্তু পথ হারায় না; সে স্বর্গ ও নিজের ঘর-উভয়ের প্রতিই বিশ্বস্ত)। তিনি সত্যিই সত্যেন্দ্রনাথ বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশ চন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহার মতো বাঙ্গালি বিজ্ঞান সাধকের যথার্থ উত্তরসূরী। প্রকৃত বিদ্বান ব্যক্তি যে বিনয়ী হন, তা ড. সেনকে দেখলেই বোঝা যায়।

শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়ের প্রবাদপ্রতিম প্রধান শিক্ষক জ্যোতির্বিকাশ মিত্রের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধ ছিল। শতবার্ষিকীর প্রাক্কালে তিনি বিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা গবেষণাগারের উন্নতিকল্পে ও একটি গ্যালারি তথা স্মার্ট ক্লাসরুম তৈরির জন্য বিশাল অঙ্কের অর্থ দান করেন। আমরা ওই গ্যালারিটি তাঁর পিতা বা ওনার নামে করতে চাইলে, তিনি পরিষ্কারভাবে বলে দেন মাস্টারমশাই জ্যোতির্বিকাশ মিত্রের নামে করুন। সরল সাদাসিধে জীবন ও উচ্চ চিন্তার মূর্ত প্রতীক ছিলেন ওর মাস্টার মশাই। মা গৌরী সেন এসেছিলেন ওই গ্যালারিটি উদ্বোধন করতে। কথায় কথায় বলেছিলেন, মণি (ড. সেনের ডাকনাম) ঝড় বৃষ্টিবাদলা উপেক্ষা করেও প্রতিদিন স্কুলে আসতো। স্কুল কামাই করতো না। জিজ্ঞেস করেছিলাম, মাসিমা বলুন তো আপনার মণি ছোটোবেলায় কেমন ছিলেন? বললেন— ছোটো থেকেই ও খুব শান্ত স্বভাবের। আর স্কুলজীবনে ছাত্র হিসেবে ও সাধারণ ছিল। মায়ের এই বিনম্র স্বীকারোক্তিতে ওঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে এসেছিল।

পরে শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে ছাত্রদের উদ্দেশে ড. সেনকে অকপটে বলতে শুনলাম— আমি ক্লাসের সেরা ছাত্রদের মধ্যে কখনোই ছিলাম না। কিন্তু লেখাপড়াটা ভালো বাসতাম। সেদিন মাস্টারমশাইয়ের সরল অনাড়ম্বর ও ছাত্রসেবায় উৎসর্গিত মহান ও আদর্শ জীবনের কথা উল্লেখ করেছিলেন তিনি। ২০১৯ সালের ৫ জানুয়ারির সকালে অনুষ্ঠিত শতবার্ষিকী পদযাত্রায় সবার সঙ্গে পা মিলিয়ে তিনি পুরো পথ পরিক্রমা করেন। তাঁর সহপাঠীদের সঙ্গে প্রাণখোলা আড্ডা দিতেও দেখেছি। প্রত্যেকের একটাই কথা, অশোক খুব ডাউন-টু-আর্থ। ওয়ার্ডসওয়ার্থের সেই To the Skylark (১৮২৫)-এর নীতি শিক্ষা ইংরেজির ক্লাসে জ্যোতির্বিকাশ তাঁর ছাত্রের অন্তরে প্রবেশ করাতে পেরেছিলেন— আমরা যত বড়ো স্বপ্নই দেখি বা আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক উচ্চতায় পৌঁছাই না কেন, আমাদের জীবনের বাস্তব দায়িত্ব ও শিকড়কে কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এই শিকড়ের টানেই বিদেশের আরামদায়ক জীবনকে হেলায় তুচ্ছ করে স্বদেশ সেবায়, স্বদেশে থেকেই বিজ্ঞান সাধনায় নিজেকে নিবেদন করেছেন বিজ্ঞানী অশোক সেন। কোনো পুরস্কার বা স্বীকৃতি, তা সে যত বড়োই হোক তার অর্থ তিনি দেশের বিজ্ঞান চর্চার উন্নতিতে দান করে দেন। আপনভোলা স্বভাবের এই সাধক আজকের ছাত্রদের জীবনাদর্শ হতে পারেন।

কমিউনিস্টদের বুকস্টলের আসল উদ্দেশ্য হিন্দু ও হিন্দুধর্মের অপপ্রচার

হিন্দুধর্মকে অবমাননা, হিন্দু দেব-দেবী সম্পর্কে অকথা-কুকথা লিখে, ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরা সম্পর্কে অপব্যাখ্যা দিয়ে, বই রচনা করে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মনে বিষ ঢুকিয়ে তাদের বিপথগামী করবেন; হিন্দুত্ব সম্পর্কে নেগেটিভ ভাবধারা প্রচার করবেন; আর সনাতনীরা প্রগতিশীল কমিউনিজমকে বাহবা দিয়ে চুমু খাবে— এটা হয় না

স্বরূপ কুমার ধবল

দুই জার্মান ফিলোসফার সোফেনহাওয়ার ও কার্ল মার্কস। প্রথমজন ভাববাদী যাঁর যার মূল ফিলোসফি মানুষের অন্তর্লোকের কামনা, বাসনা ও আকাঙ্ক্ষাকে জয় করতে হবে। উপনিষদ পাঠ করতে করতে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন— 'সমগ্র বিশ্বে উপনিষদ অধ্যয়নের মতো এত উপকারী এবং এত উন্নত কোনো শিক্ষা নেই। এটি আমার জীবনের সান্ত্বনা এবং এটিই আমার মৃত্যুর সান্ত্বনা হবে।' অন্যদিকে কার্ল মার্কস ছিলেন বস্তুবাদী, তাঁর মূল ফিলোসফি ছিল— 'ধর্ম হলো নিপীড়িত প্রাণীর দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন বিশ্বের হৃদয় এবং আত্মাহীন অবস্থার আত্মা। এটি মানুষের পক্ষে আফিমের নেশাস্বরূপ।'

কার্ল মার্কসের গুরু হলেন আর একজন জার্মান ফিলোসফার গেয়র্গ ভিলহেল্ম ফ্রিডরিখ হেগেল। শ্রীমদ্ভগবত গীতা তিনি গভীরভাবে পাঠ করেছিলেন এবং সে সম্পর্কে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন। শোনা যায় কার্ল মার্কস তাঁর কাছ থেকে গীতা অধ্যয়ন করেছিলেন। হেগেলের ফিলোসফি ছিল— 'ধর্ম হলো মানুষের আত্মপোলব্ধির একটি অত্যাবশ্যকীয় রূপ, যার মাধ্যমে মানুষের মন পরমাত্মা বা পরম সত্যের সঙ্গে তার সম্পর্ককে প্রকাশ করে।'

মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ মূলত হেগেলের তত্ত্বের বিশ্লেষণ মাত্র। গুরুলব্ধ জ্ঞান থেকেই জন্ম নিয়েছিল মার্কসের থিসিস, অ্যান্টি থিসিস ও সিন্থেসিস।

পশ্চিমবঙ্গের বাম শাসনের ৩৪ বছর হলো থিসিস। তাহলে অ্যান্টি-থিসিস হলো ১৫ বছরের তৃণমূল শাসন আর সিন্থেসিস হলো ধ্বংসের সুতিকাগার থেকে বেরিয়ে আসা বিজেপি পরিচালিত বর্তমান রাজ্য সরকার। মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অনুযায়ী সিন্থেসিস সব সময় থিসিস ও অ্যান্টি-থিসিসের চেয়ে উৎকৃষ্টতর।

সদ্য দুর্গাপূজাতে ঘটে যাওয়া মার্কসীয় বুক স্টলে আক্রমণ হলো সিন্থেসিস অর্থাৎ জনগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। সনাতন ভারতবর্ষের মানুষ উপনিষদের তত্ত্বজ্ঞানে বিশ্বাসী। কমরেড লেনিন বলেছেন— 'Practice without theory is blind and theory without practice is futile.' অর্থাৎ 'তত্ত্বজ্ঞান ছাড়া প্রয়োগ হলো অন্ধের মতো চলা, আর প্রয়োগ ছাড়া তত্ত্বজ্ঞান অর্থহীন।'

অতএব প্রয়োগ খুব গুরুত্বপূর্ণ এক সাংগঠনিক রূপরেখা। কমিউনিজমের আর এক ম্যানিফেস্টো হলো, ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতা। সুতরাং নাস্তিক হয়ে হিন্দুর পূজা-পার্বণে শামিল হয়ে মণ্ডপের পাশে বুক স্টল দিলে পার্টির শঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে দুষ্ট বলে গণ্য হয়। পার্টির নেতা কর্মী বা কোনো স্তরের কমিটি কমিউনিস্ট নীতি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অনুসরণে ব্যর্থ হলে, তার বিরুদ্ধে পার্টি সংবিধানে শৈথিল্য প্রদর্শনের জায়গা নেই। কঠোরতম শাস্তি দান করে শুদ্ধীকরণ পদ্ধতি জরুরি হয়ে পড়ে।

একশ্রেণীর তত্ত্বজ্ঞানী মানুষ কমিউনিস্টদের বুক স্টল ভেঙে দিয়ে সেই মণ্ডপ প্রাঙ্গণে শুদ্ধীকরণ প্রক্রিয়া চালিয়েছে মাত্র। এতে সত্যনিষ্ঠ, আদর্শবাদী, নিবেদিতপ্রাণ কমরেডদের আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু তবুও তারা আপত্তি জানিয়েছে।

হে নীতিভ্রষ্ট ও স্মৃতিভ্রষ্ট কমরেড! আত্মসমালোচনা নাকি আপনাদের পার্টি শক্তির চারটি স্তম্ভের মধ্যে একটি। তাই শুধু সমালোচনা না করে আত্মসমালোচনায় মন দিন। আত্মবিশ্লেষণ করে দেখুন এই আক্রমণের প্রকৃত কারণ কী? বুক স্টল ভাঙতে বুলডোজার, শরৎচন্দ্র-নেতাজী-বিবেকানন্দ-মাধ্যমিক টেস্ট পেপার্স ছুঁড়ে দিল, ছিঁড়ে দিল, ফেলে দিল, পুড়িয়ে দিল বলে হোক কলরব করলে জনগণের সহানুভূতি আপনারা পাবেন না। আপনাদেরই পার্টি কর্মসূচির ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা আছে 'জনগণ হলো সার্বভৌম।' পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে এমনকী সমগ্র বিশ্বের জনগণ আপনাদের মার্কসবাদকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে এবং দিচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে আপনাদের কমিউনিজম সম্পূর্ণভাবে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। সমগ্র বিশ্ববাসীকে এক পরিণতিহীন অলীক কল্পনার মায়ালোকে এতদিন আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন আপনারা। কিন্তু ভুলে যাবেন না নবীন প্রজন্ম কেবল দিল্লিতে নেই, পশ্চিমবঙ্গেও সমানভাবে সক্রিয়।

কমিউনিস্টরা গোমাংস খেয়ে মা দুর্গাকে অকথা-কুকথা বলবে, হিন্দু দেব-দেবীকে গালি-গালাজ করবে, আর হিন্দুসমাজ তা মুখ বুজে মেনে নেবে— এমনটা ভাবলেন কী করে? হিন্দু ধর্ম সহনশীল ও ক্ষমাশীল, তাই এখনো আপনারা আন্দোলন করতে পারছেন।

ঈদে, মহরমে বা বড়দিনে মসজিদে বা চার্চের পাশে বুক স্টল করে তাদের আরাধ্য পয়গম্বর বা যীশুর বিরুদ্ধে অকথা-কুকথা বলে ইসলাম বা ইসাই মতের অপব্যাখ্যামূলক বই বিক্রি করে আপনারা নিজেদের একটু

পৌরুষত্ব প্রকাশ করুন দেখি! তখন বোঝা যাবে আপনারা কতখানি প্রগতিশীল।

বামপন্থীরা তো নাস্তিক, তাহলে হিন্দুর পূজাতে বুক স্টল করে বই বিক্রির এত লোভ কেন? মণ্ডপের ধারে কাছে ঘেঁসাটাই তো আপনাদের ইস্তেহার বিরোধী। আপনাদের ইস্তাহারের ৬১ নম্বর পৃষ্ঠায় লেখা আছে, 'But communism abolishes eternal truth, it abolishes all religion.'

লেনিনবাদ বলে, 'বলশেভিকদের পরম কর্তব্য ভুল ত্রুটি সংশোধন করা।' রাস্তায় গলা না ফাটিয়ে বরং বামপন্থীদের সেই পথ অনুসরণ করা উচিত। সৃষ্টির সময় থেকে বামপন্থীরা হিন্দুধর্মকে অবমাননা করে যে ভুল ও পাপকর্ম করেছে তারই ফল আজ আপনাদের ভুগতে হচ্ছে। এই ভ্যান্ডালিজমের পথপ্রদর্শনকারী ফ্রাঙ্কেনস্টাইন আপনারাই।

পার্টি অফিসে আপনারা মার্কস, লেনিন, মাও, চে'র ছবি ঝুলিয়ে রাখেন, কিন্তু সেখানে মা সরস্বতী, ভারতমাতা, বিবেকানন্দ, নেতাজী, রবীন্দ্রনাথের ছবি স্থান পায় না। বুক স্টলে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবত গীতা, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, ষড়দর্শন প্রভৃতি স্থান পায় না। আপনারা তো নিজেদের শিক্ষিত বলেন; অবশ্যই টিএস এলিয়টের 'দ্য ওয়েস্টল্যান্ড' পড়েছেন— 'Dutta, Dayadhvam, Damyata– Shantih shantih shantih' স্মরণ করতে পারছেন কী এটা এলিয়ট কোথা থেকে নিয়েছিলেন? রামমোহন রায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায়'কে আপনারা প্রগতিশীল আখ্যা দেন। কিন্তু তাঁদের উপনিষদ গ্রন্থাবলী বা 'হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস' বুকস্টলে রাখতে আপনাদের বুক বিদীর্ণ হয়ে যায়। আর বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণ করতে হলে তো আপনাদের মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী রাখেন ঠিকই কিন্তু স্বামীজীর 'হিন্দু রাষ্ট্রচিন্তা' গ্রন্থ কিংবা শঙ্করাচার্যের দর্শন গ্রন্থ দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক গ্রন্থাবলী কিংবা তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' আপনাদের কাছে ব্রাত্য। হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ ও অপব্যাখ্যামূলক গ্রন্থের পসরা সাজান; কিন্তু ইসলাম বা খ্রিস্টান মতের কুসংস্কার ও মোল্লাবাদের বিরুদ্ধাচরণমূলক একটি গ্রন্থও রাখেন না প্রগতিশীল বুক স্টলে। এই দ্বিচারিতা, ভণ্ডামি এবং হিন্দুধর্মের অবমাননা করার জন্য আক্রমণ করেছে বর্তমান নবীন প্রজন্ম।

আপনাদের এতই গ্রন্থপ্রীতি যে আপনারা গান্ধীজীর বই পুড়িয়েছেন (১৯৭০, ১০ এপ্রিল); মনুসংহিতা পুড়িয়েছেন, ওঁ প্রতীক পুড়িয়েছেন, আনন্দমঠ পুড়িয়েছেন (১৯৩৭, অক্টোবর); শ্রীমদ্ভগবত গীতাকে মাটিতে ফেলে লাথি মেরেছেন (২০২০, ১০ ফেব্রুয়ারি)। শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ওই কাসুন্দি আর ঘাঁটবেন না। সমাজ পরিবর্তনশীল আপনাদের বিজ্ঞান অনুযায়ী।

প্রগতিশীলরা আবার 'গথিক' (অতিপ্রাকৃত) মানে না। আসলে আপনারা বিজ্ঞানকেও মানেন না। তাইতো আপনাদের স্টলে 'শুশ্রুত সংহিতা', 'বৈমানিক সংহিতা' স্থান পায় না। বিশ্ব বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা' গ্রন্থকে আপনারা অর্থহীন আখ্যা দেন। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে আপনারা অপব্যাখ্যা দেন, আর ভারতীয় প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রকে যদি কমঃ শ্যামল চক্রবর্তী মান্যতা দিতেন; তাহলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আজ বামপন্থীদের চিৎকার করতে হতো না। যেকোনো দেশ ও জাতির জন্য বামপন্থা বিপজ্জনক। যদিও দেশ, সীমারেখার ধারণা কমিউনিজমে নেই। তবু আপনাদের পেটেন্ট স্লোগান— কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি। প্রগতিশীলতার দোহাই দিয়ে সব রকম অত্যাচার ও অবনতির জন্য বামপন্থীরা ধর্মকে দায়ী করেছেন। মা দুর্গা-কে কলঙ্কিত ও কলুষিত করবার চেষ্টা করছেন। মা দুর্গাকে পারস্যের বারাঙ্গনা অ্যানার সঙ্গে তুলনা করেছেন, কোন টেলারে ব্লাউজ করান, কীভাবে পাশ ফিরে শুয়ে থাকেন, মা দুর্গা বহিরাগত— এসব বলে নিজেদের কদর্য রুচির পরিচয় দিয়েছেন। ফল কী হলো? ভারতবর্ষ কমিউনিজমকে ডাস্টবিনে পাঠিয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন— 'হিন্দু যেন কখনো তার ধর্ম ত্যাগ না করে। হাজার হাজার বছর ধরে ধর্মের আদর্শ ভারতবর্ষে বয়ে চলেছে; ভালোই হোক আর মন্দই হোক— শত শত শতাব্দী ধরে ভারতের পরিবেশ ধর্মের মহান আদর্শে পূর্ণ রয়েছে; ভালোই হোক আর মন্দই হোক— ধর্মের এইসব আদর্শের মধ্যেই আমরা বড়ো হয়ে উঠেছি; এখন ওই ধর্মভাব আমাদের রক্তে মিশে গেছে— আমাদের শিরায় শিরায় প্রতি রক্তবিন্দুর সঙ্গে প্রবাহিত হচ্ছে, আমাদের প্রকৃতিগত হয়ে গেছে, আমাদের জীবনীশক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।... ওঠ ভারত তোমার আধ্যাত্মিকতা দিয়ে জগৎ জয় কর।... আধ্যাত্মিকতার আদর্শ না পেলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।' মার্কসবাদ সেই আধ্যাত্মিকতাকে বিসর্জন দেবার শিক্ষা দেয়, তাই কোনো ইসলামিক দেশে মার্কসবাদকে প্রবেশ করতে দেয়নি। স্মরণ করুন, পশ্চিম পাকিস্তানে মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কমরেড সাজ্জাদ জহির ও যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের কেন প্রাণসংশয় দেখা দিয়েছিল? কোনো হিন্দুর উচিত নয় তার ধর্মের অবমাননা ও অপপ্রচার সহ্য করা। যারা সনাতন হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করবে তাদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। সরকার যদি সাংবিধানিক উপায়ে ও আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা দমন করে ভালো, নচেৎ সনাতনীদের সেই দায়ভার গ্রহণ করা উচিত নয় কি?

বুক স্টল ভাঙাকে কেন্দ্র করে নেটিজেনদের বুক ফেটে যাচ্ছে। হিন্দুধর্মকে অবমাননা, হিন্দু দেব-দেবী সম্পর্কে অকথা-কুকথা লিখে, ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরা সম্পর্কে অপব্যাখ্যা দিয়ে, বই রচনা করে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মনে বিষ ঢুকিয়ে তাদের বিপথগামী করবেন; হিন্দুত্ব সম্পর্কে নেগেটিভ ভাবধারা পোষণ করবেন; আর সনাতনীরা প্রগতিশীল কমিউনিজমকে বাহবা দিয়ে চুমু খাবে ভেবেছেন! আদালত সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে আপনাদের বুকস্টল করতে না দেওয়ার।

সনাতনীরা মা সরস্বতীর উপাসক। বইকে সম্মান করার পাঠ তাদের বামপন্থীদের কাছ থেকে শিখতে হবে না। কমিউনিস্টরা তো নাস্তিক। কোন যুক্তিতে আপনারা বলতে পারেন মা সরস্বতীর অবমাননা করেছে? আপনারা বামপন্থীরা এতটাই ধূর্ত, সেন্টিমেন্ট গঠন করার জন্য এখন মা সরস্বতীর দোহাই দিচ্ছেন? লজ্জা করে না আপনাদের! কমঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যেদিন ছাত্রাবস্থায় মা সরস্বতীর মূর্তির সঙ্গে অপকীর্তি করেছিলেন সেদিন আপনাদের খেয়াল ছিল না। একবারও তার প্রতিবাদ করেছেন, প্রগতিশীল ভণ্ডের দল। গাছেরটাও খাবেন তলারটাও কুড়াবেন ভেবেছেন! এই দ্বিচারিতা থেকেই জন্ম আপনাদের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের। সমাজ বিজ্ঞানের মুখোশধারী অসামাজিক এক একটি 'অ্যান্টি সোশ্যাল এলিমেন্ট' আপনারা।

সবশেষে বলি, দুর্গা পূজাতে মণ্ডপের পাশে বসা মেকি প্রগতিশীল বুক স্টলগুলিতে এক শ্রেণীর মানুষের আক্রমণ তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনা ও স্বাজাত্যভিমানে আঘাতের প্রতিফলন। ওরা কেউই অশিক্ষিত নয়, আর বামপন্থীদের মতো অসভ্য, বর্বর নয়। দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, যন্ত্রণা ও অবমাননার গ্লানি সহ্য করতে না পারার এক ক্ষুদ্র বিস্ফোরণ মাত্র। □

২০২৬ সালের অস্কার ক্লেইন পদকজয়ী বিজ্ঞানী ড. অশোক সেন

ড. গৌরাঙ্গ দুয়ারী

ড. অশোক সেন ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী বা থিওরিটিক্যাল ফিজিসিস্ট। স্ট্রিং তত্ত্ব, কোয়ান্টাম মহাকর্ষ (কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি) ও কৃষ্ণগহ্বর-সম্পর্কিত পদার্থবিদ্যা (ব্ল্যাক-হোল ফিজিক্স) চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণা আন্তর্জাতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৬ সালে তিনি পদার্থবিদ্যায় গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ এই মর্যাদাপূর্ণ 'অস্কার ক্লেইন' পদক লাভ করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় পদার্থবিজ্ঞানী যিনি এই সম্মান লাভ করলেন।

অস্কার ক্লেইন পদকের নামকরণ করা হয়েছে সুইডেনের বিখ্যাত তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী 'ওস্কার ক্লেইন'-এর নামে। ১৯৮৮ সালে এই পদক চালু হয়। স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয় ও রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেসের নোবেল কমিটি ফর ফিজিক্স যৌথভাবে প্রতিবছর এই পদক প্রদান করে। তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

এই পুরস্কারের সঙ্গে 'অস্কার ক্লেইন স্মারক বক্তৃতা'ও যুক্ত রয়েছে। ২০২৬ সালে বিজ্ঞানী ড. অশোক সেন স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ের আলবানোভা কেন্দ্রে এই বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল— 'স্ট্রিং থেকে মহাকর্ষ এবং মহাকর্ষ থেকে স্ট্রিং'। এই বক্তৃতায় তিনি ব্যাখ্যা করেন, কীভাবে স্ট্রিং তত্ত্বের মাধ্যমে কোয়ান্টাম মহাকর্ষ বোঝা যায় এবং কৃষ্ণগহ্বর সম্বন্ধে গবেষণা কীভাবে মহাবিশ্বের গভীর রহস্য বুঝতে সাহায্য করতে পারে।

অশোক সেন ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব কলকাতায় কাটে। তিনি কলকাতার শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। ছোটোবেলা থেকেই গণিত ও বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল।



ড. অশোক সেনের জীবন ও গবেষণা তরুণ ছাত্রছাত্রী এবং গবেষকদের জন্য অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক। কলকাতার একজন ছাত্র থেকে তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী হয়ে উঠেছেন।

বিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করার পর তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তিনি পদার্থবিদ্যা বিষয়ে পড়াশোনা করেন এবং ১৯৭৫ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ তাঁর মধ্যে পদার্থবিদ্যা, গণিত এবং যুক্তিভিত্তিক চিন্তার একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে দেয়।

এরপর তিনি 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, কানপুর'-এ ভর্তি হন। ১৯৭৮ সালে আইআইটি, কানপুর থেকে তিনি পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। আইআইটি কানপুরে পড়ার সময় উচ্চ-শক্তির পদার্থবিদ্যা এবং তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার প্রতি তাঁর আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায়।

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য তিনি আমেরিকার 'স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক অ্যাট স্টোনি ব্রুক'-এ যান। ১৯৮২ সালে তিনি পদার্থবিদ্যায় পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। এই শিক্ষা তাঁকে আধুনিক পদার্থবিদ্যা এবং আন্তর্জাতিক গবেষণার সঙ্গে পরিচিত করে তোলে।

পিএইচডি সম্পূর্ণ করার পর অশোক সেন ১৯৮২ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ফার্মিল্যাবে পোস্ট-ডক্টরাল গবেষক হিসেবে কাজ করেন। 'ফার্মিল্যাব' হলো বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কণা-পদার্থবিদ্যার গবেষণাকেন্দ্র।

এরপর ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৮ সাল

পর্যন্ত তিনি স্ট্যানফোর্ড লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেটর সেন্টারে গবেষণা করেন। এই সময় তিনি বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর সঙ্গে কাজ করেন। উচ্চ-শক্তির পদার্থবিদ্যা এবং স্ট্রিং তত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণার ভিত্তি এই সময় আরও শক্তিশালী হয়।

১৯৮৮ সালে তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চে যোগ দেন। দেশে ফিরে আসার পর তাঁর গবেষণা ভারতের তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা বিষয়ক উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পরবর্তী পর্যায়ে তিনি প্রয়াগের 'হরিশ্চন্দ্র রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এ যোগ দেন। বর্তমানে তিনি বেঙ্গালুরুর 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল সায়েন্সেস'-এ একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক হিসেবে যুক্ত আছেন।

প্রশ্ন হলো— স্ট্রিং তত্ত্ব কী? স্ট্রিং তত্ত্ব হলো এমন একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, যা মহাবিশ্ব তার সবচেয়ে মৌলিক স্তরে কীভাবে কাজ করে, তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, পদার্থের ক্ষুদ্রতম উপাদানগুলি শুধু বিন্দুর মতো কণা নয়। বরং এগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, এক-মাত্রিক বস্তু, যাদের স্ট্রিং বা সূক্ষ্ম তার বলা হয়।

সংক্ষেপে, 'স্ট্রিং থিওরি' হলো পদার্থবিজ্ঞানের একটি তাত্ত্বিক কাঠামো। এই কাঠামোটি শূন্য-মাত্রিক (জিরো-ডাইমেনশনাল) বিন্দুবৎ কণার (পয়েন্ট পার্টিক্‌ল্‌) ধারণাটিকে ক্ষুদ্র, একমাত্রিক, কম্পনশীল 'স্ট্রিং' তত্ত্বের দ্বারা প্রতিস্থাপন করে।

কম্পন পদ্ধতি (ভাইব্রেশনাল মোড্‌স্‌) : একটি বেহালা বা গিটারের তার যেমন নিজস্ব কম্পনের ধরনের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন সুর সৃষ্টি করে, তেমনই একটি মৌলিক স্ট্রিং (ফান্ডামেন্টাল স্ট্রিং)-এর স্বতন্ত্র কম্পাঙ্ক (ইউনিক ফ্রিকোয়েন্সি) এবং কম্পনের ধরন / স্পন্দনের বিন্যাস (ভাইব্রেশনাল প্যাটার্ন) নির্ধারণ করে যে, এটি কোন ধরনের কণায় পরিণত হবে (যেমন— ইলেকট্রন, কোয়ার্ক বা ফোটন)। এই স্ট্রিংগুলি বিভিন্নভাবে কম্পিত হতে পারে। প্রতিটি কম্পনের ধরন একটি আলাদা কণার মতো প্রকাশ পেতে পারে। অর্থাৎ, স্ট্রিংয়ের কম্পনের ধরন পরিবর্তিত হলে বিভিন্ন ধরনের কণা তৈরি হতে পারে।

এইভাবে স্ট্রিং তত্ত্ব প্রকৃতির বিভিন্ন কণা ও শক্তিকে একটি সাধারণ কাঠামোর মধ্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো— মহাকর্ষকে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার সঙ্গে যুক্ত করা।

কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা অত্যন্ত ক্ষুদ্র স্তরে পদার্থ ও শক্তির আচরণ ব্যাখ্যা করে। অন্যদিকে, আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ— মহাকর্ষ এবং বৃহৎ মহাজাগতিক বস্তুর আচরণ ব্যাখ্যা করে। এই দুই তত্ত্বকে একসঙ্গে যুক্ত করা বিজ্ঞানীদের কাছে দীর্ঘদিনের একটি বড়ো সমস্যা।

বিশেষ করে কৃষ্ণগহ্বরের মতো চরম পরিবেশে মহাকর্ষ এবং কোয়ান্টাম প্রভাব একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। স্ট্রিং তত্ত্ব এই দুই ক্ষেত্রের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করার একটি সম্ভাব্য পথ দেখায়।

তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় ড. অশোক সেনের অবদান : ড. অশোক সেনের গবেষণা কোয়ান্টাম মহাকর্ষের একটি সঙ্গতিপূর্ণ তত্ত্ব তৈরি করার প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। কৃষ্ণগহ্বরের কোয়ান্টাম বৈশিষ্ট্য বোঝার ক্ষেত্রেও তাঁর কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাঁর অন্যতম প্রধান গবেষণা ক্ষেত্র হল এস-ডুয়ালিটি। এস-ডুয়ালিটি একই ভৌত ব্যবস্থার বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে সম্পর্ক দেখায়। কোনো ব্যবস্থাকে কখনও শক্তিশালী মিথোস্ক্রিয়ার মাধ্যমে এবং কখনও দুর্বল মিথোস্ক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। এস-ডুয়ালিটি এই দুই ধরনের ব্যাখ্যার মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করে।

ড. অশোক সেনের গবেষণা থেকে এই ধারণা আরও শক্তিশালী হয় যে, স্ট্রিং তত্ত্বের বিভিন্ন রূপ আসলে একটি গভীর ও ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বের বিভিন্ন রূপ হতে পারে। তাঁর গবেষণা 'মডার্ন স্ট্রিং থিওরি' বা আধুনিক স্ট্রিং তত্ত্বের অগ্রগতির প্রেক্ষিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

তাঁর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো--- কৃষ্ণগহ্বরের এনট্রপি নিয়ে গবেষণা। একটি বদ্ধ তাপগতিবিদ্যা ব্যবস্থায় (বা ক্লোজড্‌ থার্মোডায়নামিক সিস্টেমে) অপ্রাপ্য শক্তির একটি পরিমাপ হলো 'এনট্রপি'। এটিকে সাধারণত ব্যবস্থাটির বিশৃঙ্খলার পরিমাপ হিসাবেও বিবেচনা করা হয়। 'এনট্রপি' বিষয়টি কোনো ভৌত ব্যবস্থার অন্তর্গত সকল সম্ভাব্য উপাদানের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বা আণুবীক্ষণিক বিন্যাসের সংখ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত।

কৃষ্ণগহ্বরেরও এনট্রপি রয়েছে। বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে বোঝার চেষ্টা করছেন যে, কোন আণুবীক্ষণিক অবস্থাসমূহ (মাইক্রোস্কোপিক স্টেট্‌স্‌) কৃষ্ণগহ্বরেরও এনট্রপি-র জন্য দায়ী। কৃষ্ণগহ্বরে এনট্রপি কীভাবে তৈরি হয়, তা বোঝার জন্য ড. অশোক সেন স্ট্রিং তত্ত্ব ব্যবহার করে নির্দিষ্ট কৃষ্ণগহ্বরের অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদানের আণুবীক্ষণিক অবস্থাসমূহ গণনা করার পদ্ধতি তৈরি করেন। তাঁর গবেষণা প্রমাণ করে যে, কৃষ্ণগহ্বরের বড়ো ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলি কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তাঁর গবেষণালব্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব— স্ট্রিং থিওরি, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা (কোয়ান্টাম মেকানিক্স) ও মহাকর্ষের (গ্র্যাভিটি)-র পারস্পরিক সংযোগকে আরও দৃঢ়ভাবে উপস্থাপন করেছে।

তিনি স্ট্রিং ক্ষেত্র তত্ত্বেও (স্ট্রিং ফিল্ড থিওরি) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এই তত্ত্বের সাহায্যে স্ট্রিংয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া ও আচরণ বোঝা যায়। তিনি অস্থিতিশীল ডি-ব্রেন (unstable D-branes) এবং ট্যাকিয়ন ঘনীভবন (Tachyon condensation নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন।

ড. সেনের প্রাপ্ত পুরস্কার ও সম্মান :

ড. অশোক সেন তাঁর অসাধারণ গবেষণার জন্য বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছেন।

(১) ১৯৮৯ সালে তিনি আইসিটিপি পুরস্কার লাভ করেন।

(২) ১৯৯৪ সালে তিনি শান্তি স্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার পান।

(৩) ১৯৯১ সালে তিনি ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেসের ফেলো নির্বাচিত হন।

(৪) ১৯৯৫ সালে তিনি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমির ফেলো হন।

(৫) ১৯৯৮ সালে তিনি রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন।

(৬) ২০০১ সালে তিনি পদ্মশ্রী সম্মান লাভ করেন।

(৭) ২০০৯ সালে তিনি ইনফোসিস প্রাইজ ইন ম্যাথমেটিক্যাল সায়েন্সেস পুরস্কার পান।

(৮) ২০১২ সালে তিনি ব্রেক থ্রু প্রাইজ ইন ফান্ডামেন্টাল ফিজিক্স পুরস্কার লাভ করেন।

(৯) ২০১৩ সালে তিনি পদ্মভূষণ সম্মান পান।

(১০) ২০১৪ সালে তিনি ডিরাক পদক লাভ করেন।

(১১) ২০২৬ সালে তিনি অস্কার ক্লেইন পদক লাভ করেন।

২০১২ সালের ফান্ডামেন্টাল ফিজিক্স পুরস্কার তাঁকে স্ট্রিং তত্ত্বের একটি ঐক্যবদ্ধ কাঠামো (ইউনিফাইং ফ্রেমওয়ার্ক ফর স্ট্রিং থিওরি) প্রতিষ্ঠায় অবদানের জন্য দেওয়া হয়।

অস্কার ক্লেইন পদকের গুরুত্ব : অস্কার ক্লেইন পদক পদার্থবিদ ড. অশোক সেনের দীর্ঘ গবেষণা জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি। তাঁর গবেষণা সরাসরি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কোনও যন্ত্র তৈরি না করলেও মহাবিশ্বের মৌলিক গঠন বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

তাঁর গবেষণা বিজ্ঞানীদের কয়েকটি গভীর প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সাহায্য করছে। প্রশ্নগুলি হলো—

(১) প্রকৃতির মৌলিক উপাদান কী?

(২) কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ও মহাকর্ষের মধ্যে সম্পর্ক কী?

(৩) কৃষ্ণগহ্বরের ভিতরে কী ঘটে?

(৪) সব কণা ও শক্তিকে কি একটি ঐক্যবদ্ধ তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব?

(৫) মহাবিশ্বের মৌলিক কাঠামো কীভাবে কাজ করে?

ড. অশোক সেনের জীবন ও গবেষণা তরুণ ছাত্র-ছাত্রী এবং গবেষকদের জন্য অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক। কলকাতার একজন ছাত্র থেকে তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী হয়ে উঠেছেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজ, আইআইটি কানপুর এবং স্টোনি ব্রুক বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষা তাঁকে একটি শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দেয়। পরবর্তীতে তাঁর গবেষণালব্ধ স্ট্রিং তত্ত্ব, এস-ডুয়ালিটি, কৃষ্ণগহ্বরের এনট্রপি, কোয়ান্টাম মহাকর্ষ এবং স্ট্রিং ক্ষেত্র তত্ত্বের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২০২৬ সালের অস্কার ক্লেইন পদক তাঁকে শুধু ব্যক্তিগতভাবে সম্মানিত করেনি--- এটি ভারতের বৈজ্ঞানিক সাফল্যকেও বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরেছে। বিজ্ঞান সাধনায় নিবেদিতপ্রাণ তাঁর জীবন সকলকে শেখায় যে, গভীর জ্ঞান, কঠোর পরিশ্রম, সৃজনশীল চিন্তা এবং নিয়মিত গবেষণার মাধ্যমে মহাবিশ্বের সবচেয়ে জটিল বিষয়গুলিও বোঝার চেষ্টা করা সম্ভব।

(লেখক অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর, ইউপিইএস ইউনিভার্সিটি, দেরাদুন)

With Best Compliments Form -

A
Well Wisher

একটি একটি স্ট্রিং ধরে মহাবিশ্বের খোঁজে

ড. অশোক সেনের অসাধারণ বৈজ্ঞানিক যাত্রা

ড. সোমনাথ গড়াই

কলকাতার শ্রেণীকক্ষ থেকে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার অগ্রসীমায় : গভীরতম স্তরে মহাবিশ্ব আসলে কী দিয়ে তৈরি? এটি বিজ্ঞানের প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে আকর্ষণীয় প্রশ্নগুলির একটি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানীরা পদার্থের মৌলিক গঠন অনুসন্ধান করে চলেছেন এবং প্রতিটি ধাপে আরও ক্ষুদ্র ও আরও মৌলিক উপাদানের সন্ধান পেয়েছেন। মহাবিশ্বের 'বিল্ডিং ব্লক' কী? অর্থাৎ মহাবিশ্ব যে সকল পদার্থ দ্বারা গঠিত তার ক্ষুদ্রতম উপাদান কী?—বিজ্ঞানীদের মনে বারবার এই প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে। যৌগ পদার্থের অণু গঠিত হয় বিভিন্ন মৌলের পরমাণু দিয়ে; পরমাণুর মধ্যে থাকে ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াস, আর নিউক্লিয়াস গঠিত প্রোটন ও নিউট্রন দিয়ে, যেগুলি আবার কোয়ার্ক ও গ্লুয়ন নামে আরও ক্ষুদ্র কণা দিয়ে তৈরি। 'হ্যাড্রন' (Hadron) হলো কণা পদার্থবিজ্ঞানে (পার্টিক্‌ল্ ফিজিক্সে) কোয়ার্ক (Quark) দ্বারা গঠিত এক ধরনের যৌগিক উপপারমাণবিক বা অতিপারমাণবিক কণা (Subatomic particle)। সংক্ষেপে বলতে হলে, 'হ্যাড্রন'-এর সংজ্ঞা হলো— যে সব যৌগিক উপপারমাণবিক কণা দুই বা ততোধিক কোয়ার্ক দ্বারা গঠিত এবং শক্তিশালী নিউক্লীয় বলের (Strong Nuclear Force) দ্বারা একত্রে আবদ্ধ থাকে। হ্যাড্রনকে প্রধানত দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় :

(১) ব্যারিয়ন (Baryon) : তিনটি কোয়ার্ক দ্বারা গঠিত (যেমন— প্রোটন ও নিউট্রন)।

(২) মেসন (Meson) : একটি কোয়ার্ক ও একটি অ্যান্টিকোয়ার্ক দ্বারা গঠিত (যেমন— পাই-মেসন ও মিউ-মেসন)।

প্রোটন ও নিউট্রন হলো সবচেয়ে পরিচিত ও সাধারণ হ্যাড্রন, যা পরমাণুর নিউক্লিয়াস গঠন করে। কোয়ার্ক ও গ্লুয়ন একত্রে হ্যাড্রন গঠন করে, যা শক্তিশালী নিউক্লীয় বল দ্বারা আবদ্ধ থাকে এবং চরম তাপমাত্রা ও ঘনত্বের অধীনে এরা 'কোয়ার্ক-গ্লুয়ন প্লাজমা' নামক এক প্রকার পদার্থগত অবস্থায় উপনীত হয়। কোয়ার্কগুলি দলবদ্ধভাবে একত্রিত হয় (যেমন প্রোটন ও নিউট্রনে তিনটি কোয়ার্ক থাকে) এবং গ্লুয়ন 'বিনিময় কণা' (এক্সচেঞ্জ পার্টিক্‌ল্) বা 'আঠা' হিসেবে কাজ করে যা শক্তিশালী নিউক্লীয় বলের ব্যবস্থাপক হিসাবে এদের একত্রে ধরে রাখে। কিন্তু প্রকৃতির মৌলিক গঠন-উপাদানের সন্ধানে এই যাত্রা কি কোয়ার্কেই শেষ, নাকি তাদের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে আরও মৌলিক কিছু?

বিশ্বের অন্যতম বিশিষ্ট তাত্ত্বিক পদার্থবিদ অধ্যাপক ড. অশোক সেন তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনের বড়ো অংশ এই গভীর প্রশ্নের অনুসন্ধানে উৎসর্গ করেছেন। তাঁর গবেষণা তাঁকে নিয়ে গিয়েছে স্ট্রিং তত্ত্বের বিস্ময়কর জগতে— যেখানে মহাবিশ্বের মৌলিক উপাদানগুলি হয়তো বিন্দুসদৃশ কণা নয়, বরং অকল্পনীয় রকমের ক্ষুদ্র, কম্পমান স্ট্রিং বা তন্তু।

১৯৫৬ সালে জন্ম নেওয়া অশোক সেনের বৈজ্ঞানিক যাত্রা শুরু হয়েছিল কলকাতায়, যেখানে তিনি ১৯৬২ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। এরপর তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং কানপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে (কানপুর আইআইটি-তে) অধ্যয়ন করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি ডক্টরেট গবেষণার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেন এবং স্টোনি ব্রুক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮২ সালে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। ডক্টরেটের পর তিনি দু'টি মর্যাদাপূর্ণ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন— শিকাগোর কাছে ফার্মিল্যাব এবং ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেটর সেন্টার (SLAC)। ১৯৮৮ সালে তিনি ভারতে ফিরে মুম্বইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চে (TIFR) যোগ দেন। পরে তিনি প্রয়াগের হরিশ্চন্দ্র রিসার্চ ইনস্টিটিউটে যোগদান করেন এবং শেষ পর্যন্ত বেঙ্গালুরুর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল সায়েন্সেসে (ICTS) যোগ দেন, যেখানে তিনি বর্তমানে ICTS-ইনফোসিস মাধব চেয়ার প্রফেসর হিসেবে কর্মরত।

সম্প্রতি তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় ড. সেনের অসামান্য অবদান আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাঁর প্রাপ্ত সম্মানের তালিকায় রয়েছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য জি. ডি. বিড়লা পুরস্কার (১৯৯৬), TWAS পুরস্কার (১৯৯৭), রয়্যাল সোসাইটির ফেলোশিপ (১৯৯৮), পদ্মশ্রী (২০০১), গাণিতিক বিজ্ঞানে ইনফোসিস পুরস্কার (২০০৯), মৌলিক পদার্থবিদ্যায় ব্রেকথ্রু পুরস্কার (২০১২), পদ্মভূষণ (২০১৩) এবং ডিরাক পদক (২০১৪)। ২০২৬ সালে তিনি প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানী হিসেবে মর্যাদাপূর্ণ 'অস্কার ক্লেইন' পদক লাভ করেন, যা স্ট্রিং তত্ত্ব ও কৃষ্ণগহ্বর-সংক্রান্ত পদার্থবিদ্যা চর্চায় তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদত্ত একটি আন্তর্জাতিক সম্মান। এই বিশিষ্ট পদকের পূর্ববর্তী প্রাপকদের মধ্যে রয়েছেন সি. এন. ইয়াং, হান্স বেথে এবং স্টিফেন হকিংয়ের মতো খ্যাতনামা পদার্থবিদেরা। এই স্বীকৃতিগুলি কেবল একটি ব্যতিক্রমী বৈজ্ঞানিক জীবনেরই প্রতিফলন নয়— মৌলিক জ্ঞানের বিকাশে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের ক্রমবর্ধমান অবদানেরও প্রতিফলন।

স্ট্রিং তত্ত্ব— ক্ষুদ্র কম্পমান স্ট্রিংয়ের মধ্য দিয়ে মহাবিশ্বকে উপলব্ধি : বিজ্ঞানী ড. অশোক সেনের অবদান বুঝতে হলে প্রথমে স্ট্রিং তত্ত্বের মূল ধারণাটি বোঝা জরুরি। প্রচলিত পদার্থবিদ্যা মৌলিক

কণাগুলিকে বিন্দুসদৃশ বস্তু হিসেবে বর্ণনা করে; কিন্তু স্ট্রিং তত্ত্বের প্রস্তাব হলো— প্রকৃতির মৌলিক গঠন-উপাদানগুলি আসলে অকল্পনীয় রকমের ক্ষুদ্র, একমাত্রিক, কম্পমান স্ট্রিং। গিটারের একটি তার যেমন ভিন্ন ভিন্ন কম্পনের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন সুর সৃষ্টি করে, তেমনই এই মৌলিক স্ট্রিংগুলি হয়তো ভিন্ন ভিন্ন কণার জন্ম দেয়, যেমন ইলেকট্রন, ফোটন এবং মহাকর্ষের সঙ্গে যুক্ত কণা। আধুনিক পদার্থবিদ্যার অন্যতম বড়ো চ্যালেঞ্জ হল আণুবীক্ষণিক জগতের বর্ণনাকারী কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সঙ্গে মেলানো, যে তত্ত্ব মহাকর্ষ এবং বৃহৎ পরিসরে মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করে। স্ট্রিং তত্ত্ব এই দুই তত্ত্বকে একসূত্রে বাঁধার একটি সম্ভাব্য গাণিতিক কাঠামো প্রদান করে। ড. সেন দেখিয়েছিলেন যে স্থান-কালের মধ্য দিয়ে স্ট্রিংয়ের গতির সুসঙ্গতি আইনস্টাইনের মহাকর্ষের সমীকরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, যার মধ্যে স্ট্রিং তত্ত্বের পূর্বাভাসিত অতিরিক্ত সংশোধনগুলিও অন্তর্ভুক্ত।

স্ট্রিং তত্ত্ব অতিরিক্ত স্থানিক মাত্রার অস্তিত্বের ইঙ্গিতও দেয়, যেগুলি হয়তো অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে এবং সেই কারণে আমাদের কাছে অদৃশ্য থেকে যায়। এই তত্ত্ব 'ডি-ব্রেন' নামে এক ধরনের বস্তুর ধারণাও নিয়ে আসে, যাদের বিস্তৃত পর্দা বা ঝিল্লির মতো কল্পনা করা যায়, যার উপর নির্দিষ্ট কিছু স্ট্রিংয়ের প্রান্ত আটকে থাকে। নতুন ভৌত সমাধান নির্মাণের গাণিতিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করে অধ্যাপক সেন এদের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন; এই সমাধানগুলির মধ্যে আহিত স্ট্রিং ও কৃষ্ণগহ্বর-সংবলিত বিন্যাসও রয়েছে। তাঁর গবেষণার আরেকটি প্রধান অবদান দ্বৈততা (ডুয়ালিটি) সংক্রান্ত, অর্থাৎ এই ধারণা যে আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন দু'টি ভৌত তত্ত্ব আসলে একই অন্তর্নিহিত বাস্তবতাকে বর্ণনা করতে পারে। বিশেষ করে, ড. সেন সবল-দুর্বল দ্বৈততার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ উপস্থাপন করেন, যা দেখায় কীভাবে সবল মিথোস্ক্রিয়াযুক্ত একটি জটিল ব্যবস্থাকে কখনও কখনও দুর্বল মিথোস্ক্রিয়াযুক্ত একটি সমতুল্য ব্যবস্থার মাধ্যমে বোঝা যায়। ব্যাপারটি অনেকটা একটি জটিল বার্তাকে তার অর্থ না বদলে এমন আরেকটি ভাষায় অনুবাদ করার মতো, যে ভাষায় তা বোঝা সহজ। বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক আধান নিয়ে তাঁর কাজ এই সংযোগের পক্ষে জোরালো প্রমাণ জুগিয়েছিল এবং দ্বৈততার শক্তির প্রতি পদার্থবিদদের আস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে দৃঢ় করেছিল।

কৃষ্ণগহ্বর, কোয়ান্টাম রহস্য এবং এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উত্তরাধিকার : ড. অশোক সেনের গবেষণার সবচেয়ে আকর্ষণীয় ক্ষেত্রগুলির একটি হলো— কৃষ্ণগহ্বরের পদার্থবিদ্যা। কৃষ্ণগহ্বর হলো মহাশূন্যের এমন এক অঞ্চল, যেখানে মহাকর্ষ এতটাই প্রবল যে এর সীমানা, যাকে 'ঘটনা দিগন্ত' (ইভেন্ট হরাইজন) বলা হয়, একবার পেরিয়ে গেলে কোনো কিছুই, এমনকি আলোও, আর বেরিয়ে আসতে পারে না। আশ্চর্যের বিষয়, কৃষ্ণগহ্বরের এনট্রপি নামে একটি ধর্ম রয়েছে, যা আমাদের জানায় কতগুলি ভিন্ন আণুবীক্ষণিক বিন্যাস একই পর্যবেক্ষণযোগ্য ভৌত অবস্থা তৈরি করতে পারে। ড. সেন স্ট্রিং তত্ত্ব ব্যবহার করে এই লুকোনো বিন্যাসগুলি অনুসন্ধান করেন এবং দেখান যে আণুবীক্ষণিক অবস্থাগুলি গণনা করে কৃষ্ণগহ্বর পদার্থবিদ্যা বা ব্ল্যাক-হোল ফিজিক্সের পূর্বাভাসিত এনট্রপির মান পুনরায় পাওয়া সম্ভব। এটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক প্রমাণ দেয় যে, কৃষ্ণগহ্বরের একটি অন্তর্নিহিত আণুবীক্ষণিক গঠন রয়েছে এবং সেগুলি নিছক শূন্য স্থানের রহস্যময় অঞ্চল নয়।

ড. সেন এরপর 'এনট্রপি ফাংশন ফর্মালিজম' নামে একটি গাণিতিক পদ্ধতি গড়ে তোলেন, যা পদার্থবিদদের নির্দিষ্ট কিছু কৃষ্ণগহ্বরের ধর্ম ও এনট্রপি আরও নির্ভুলভাবে গণনা করতে সাহায্য করে। পরে তিনি এই পদ্ধতিকে প্রসারিত করে এর মধ্যে কোয়ান্টাম প্রভাবও অন্তর্ভুক্ত করেন; এই প্রভাবগুলি উদ্ভূত হয় অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে পদার্থ ও শক্তির আচরণ থেকে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য অবদান হল ড. সেনের অনুমান (সেন কনজেকচার), যা ব্যাখ্যা করে কীভাবে স্ট্রিং তত্ত্বের অস্থিতিশীল কাঠামোগুলি বিলুপ্ত হয়ে আরও স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছাতে পারে। এটি বোঝার জন্য কল্পনা করুন যে— একটি পাহাড়ের চূড়ায় একটি বল কোনোক্রমে ভারসাম্য বজায় রেখে আছে; সেটি সাময়িকভাবে সেখানে থেকে যেতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গড়িয়ে নেমে আসে আরও স্থিতিশীল কোনো অবস্থানের দিকে। একইভাবে, ড. সেন প্রস্তাব করেন যে, 'ডি২৫-ব্রেন' নামের একটি অস্থিতিশীল বস্তু (বোসনিক স্ট্রিং তত্ত্বে ২৫টি স্থানিক মাত্রা জুড়ে বিস্তৃত একটি তাত্ত্বিক কাঠামো) বিলুপ্ত হয়ে যায়, যখন 'ট্যাকিয়ন' নামের একটি ক্ষেত্র নিম্নতর শক্তির অবস্থার দিকে বিবর্তিত হয়। এখানে 'ট্যাকিয়ন' বলতে আলোর চেয়ে দ্রুতগামী কোনো সাধারণ কণাকে বোঝানো হচ্ছে না; বরং এটি ব্যবস্থাটির অস্থিতিশীলতাকে নির্দেশ করে। 'অধ্যাপক সেনের অনুমান' নামে পরিচিত তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার এই ধারণাটি স্ট্রিং তত্ত্বের একটি বড়ো অগ্রগতি-স্বরূপ যা অস্থিতিশীল বিন্যাস কীভাবে স্থিতিশীল বিন্যাসে রূপান্তরিত হয়, তা বুঝতে পদার্থবিদদের সাহায্য করে।

৩০০-রও বেশি গবেষণাপত্রের মাধ্যমে ড. অশোক সেন স্ট্রিং তত্ত্ব, কৃষ্ণগহ্বর পদার্থবিদ্যা ও কোয়ান্টাম মহাকর্ষের ক্ষেত্রে এবং মহাবিশ্বের মৌলিক গঠন সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধিতে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাঁর গবেষণা— মহাকর্ষ, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা এবং বিশ্ব-প্রকৃতির গাণিতিক বর্ণনার মধ্যে বিস্ময়কর সংযোগ উন্মোচন করেছে। স্ট্রিং তত্ত্ব যদিও এখনও প্রত্যক্ষ পরীক্ষামূলক সমর্থন পায়নি, তবুও এটি আধুনিক পদার্থবিদ্যার কয়েকটি গভীরতম প্রশ্ন অনুসন্ধানের এক শক্তিশালী কাঠামো প্রদান করে। কলকাতার শ্রেণীকক্ষ থেকে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত অধ্যাপক ড. সেনের এই বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রতি কৌতূহল, নিষ্ঠা এবং নিরবচ্ছিন্ন মৌলিক গবেষণার গুরুত্বকে তুলে ধরে। তাঁর সাফল্য প্রমাণ করে যে, ভারতীয় বিজ্ঞানীরা আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান গবেষণা ও তত্ত্বোপলব্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেন। সর্বোপরি, তাঁর কাজ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে মহাবিশ্বকে বুঝতে হলে আমরা যা সরাসরি দেখতে পাই তার বাইরে তাকাতে হবে এবং খুঁজে দেখতে হবে সেই মৌলিক নীতিগুলিকে, যা পদার্থের ক্ষুদ্রতম উপাদান থেকে মহাবিশ্বের বৃহত্তম কাঠামো পর্যন্ত সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে।

(লেখক বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়-স্থিত গ্রিন কেপলারেট ল্যাবরেটরির মুখ্য গবেষক)

ভারতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-তে অনুসৃত পঞ্চকোষ পদ্ধতি এবং পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানবদর্শন

ডঃ বিশ্বরূপ ঘটক

ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-তে প্রাচীন ভারতীয় তৈত্তিরীয় উপনিষদের পঞ্চকোষ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ বিকাশের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই সামগ্রিক মানব-বিকাশের ধারণাটি পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের অখণ্ড মানবদর্শনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। উভয় ধারণাই মানুষকে কেবল একটি অর্থনৈতিক বা বস্তুগত একক হিসেবে না দেখে শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মার এক সমন্বিত রূপ হিসেবে বিবেচনা করে।

পঞ্চকোষ পদ্ধতি : বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষানীতিতে প্রয়োগ

পঞ্চকোষ তত্ত্ব অনুযায়ী, মানুষের সত্তা পাঁচটি স্তরে (কোষ) বিভক্ত। এনইপি ২০২০ এই পাঁচটি স্তরেরই সমান্তরাল বিকাশের জন্য একটি রূপরেখা তৈরি করেছে :

● **অন্নময় কোষ (শারীরিক স্তর) :** এটি মানুষের স্থূল শরীর। শিক্ষানীতিতে পুষ্টি, শারীরিক শিক্ষা, ক্রীড়া ও যোগাসনের মাধ্যমে এই কোষের বিকাশ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

● **প্রাণময় কোষ (প্রাণশক্তি স্তর) :** এটি জীবনশক্তি ও শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যুক্ত। বিদ্যালয়ে প্রাণায়াম, সচেতনতা এবং বিভিন্ন শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

● **মনোময় কোষ (মানসিক ও মানসিক স্তর) :** এটি মন, আবেগ ও অনুভূতির জগৎ। সাহিত্য, চারুকলা, নাটক এবং সামাজিক- আবেগীয় শিক্ষার মাধ্যমে মনকে ইতিবাচক ও সহনশীল করে তোলাই মূল বৈশিষ্ট্য।

● **বিজ্ঞানময় কোষ (বুদ্ধিবৃত্তিক স্তর) :** এটি মানুষের বিবেক, যুক্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। মুখস্থ বিদ্যার বদলে বাস্তবভিত্তিক শিক্ষণ, স্টেম শিক্ষা ও সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার মাধ্যমে এই বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরকে শাণিত করা হয়।

● **আনন্দময় কোষ (আধ্যাত্মিক স্তর) :** এটি মানুষের ভেতরের পরম আনন্দ, নৈতিকতা ও পরার্থপরতার স্তর। মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা, সমাজসেবা ও আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষণের সাহায্যে শিক্ষার্থীর অন্তরের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চেতনা জাগ্রত করা হয়।

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের অখণ্ড মানবতাবোধ :

১৯৬৫ সালে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এই দর্শনের অবতারণা করেন। এটি পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের যান্ত্রিক বস্তুবাদের বাইরে গিয়ে একটি সম্পূর্ণ ভারতীয় ও মানবিক জীবনদর্শনের কথা বলে।

● **সমন্বিত ব্যক্তিত্ব :** অখণ্ড মানবদর্শনের মূল কথা হলো— মানুষ শুধু পেট বা মনের সমাহার নয়। মানুষ একই সঙ্গে শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মার সমন্বিত রূপ। এর যেকোনো একটির অবহেলা মানব প্রগতির অন্তরায়।

● **পুরুষার্থ চতুষ্টয় :** মানুষের জীবনের পূর্ণতার জন্য চারটি লক্ষ্য অর্জনের কথা বলা হয়েছে— ধর্ম (নৈতিকতা), অর্থ (সম্পদ), কাম (কামনা/তৃপ্তি) ও মোক্ষ (মুক্তি)।

● **ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্পর্ক :** ব্যক্তি (ব্যষ্টি), সমাজ (সমষ্টি), প্রকৃতি (সৃষ্টি) ও পরমাত্মা (পরমেষ্ঠী)— এই চারটির মধ্যে কোনো সংঘাত নেই, বরং এরা একে অপরের পরিপূরক ও একসূত্রে গাঁথা।

● **অন্ত্যোদয় :** সমাজের একেবারে শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা দরিদ্রতম মানুষটির কল্যাণ সাধনই হলো প্রকৃত উন্নয়ন।

পারস্পরিক সম্পর্ক : পঞ্চকোষ ও অখণ্ড মানবতাবোধ

এই দুটি দর্শনের মধ্যে গভীর অভ্যন্তরীণ ও তাত্ত্বিক মিল রয়েছে, যা নিম্নরূপ টেবিলের মাধ্যমে বোঝা সম্ভব :

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের অখণ্ড মানবতাবোধের স্তর— পঞ্চকোষ পদ্ধতির সূত্র এবং এনইপি ২০২০ অনুসারে শিক্ষার লক্ষ্য হলো শরীর, মন, বুদ্ধি আত্মার সামগ্রিক বিকাশ। অন্নময় ও প্রাণময় কোষ পুষ্ট করে শরীর, গড়ে তুলে সুস্বাস্থ্য— বিকশিত হয় জীবনশক্তি ও কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। মন বা মনোময় কোষ আবেগ নিয়ন্ত্রণ, সহমর্মিতা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটায়। বুদ্ধি বা বিজ্ঞানময় কোষ যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। আত্ম বা আনন্দময় কোষ নৈতিক চেতনা, আত্মিক শান্তি এবং বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে।

জাতীয় শিক্ষানীতি হলো পঞ্চকোষ পদ্ধতি ও দীনদয়াল উপাধ্যায়ের চিন্তার সংযোগবিন্দু। দীনদয়াল উপাধ্যায় শরীর-মন-বুদ্ধি-আত্মার সামগ্রিক বিকাশের মাধ্যমে যে অখণ্ড মানবসত্তার বিকাশ চেয়েছিলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর পঞ্চকোষ পদ্ধতি ঠিক সেই লক্ষ্য অর্জনেরই একটি প্রায়োগিক শিক্ষাগত মাধ্যম বা রোডম্যাপ। বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এই দুই দর্শনের সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি :

● **একমুখী শিক্ষার অবসান :** বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকটাই ডিগ্রি ও চাকরি-কেন্দ্রিক (অর্থ ও কর্ম নির্ভর)। এই দুটি দর্শন শিক্ষাকে কেবল উপার্জনের মাধ্যম না বানিয়ে মানুষের মানবিক ও নৈতিক চরিত্র গঠনে পথ দেখায়।

● **মানসিক অবসাদ দূরীকরণ :** আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতাশা ও মানসিক চাপ বাড়ছে। পঞ্চকোষের 'মনোময়' ও 'আনন্দময়' স্তরের চর্চা শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে এবং জীবনকে আনন্দময় করতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

● **সামাজিক দায়বদ্ধতা ও অন্ত্যোদয় :** অখণ্ড মানবদর্শনের 'অন্ত্যোদয়' এবং শিক্ষানীতির 'সমতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা' একই সূত্রে গাঁথা। এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মনে সমাজের অনগ্রসর মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা তৈরি করে।

● **পরিবেশ ও প্রকৃতির সঙ্গে মেলবন্ধন :** অখণ্ড মানবদর্শন মানুষকে প্রকৃতির প্রভু নয়, বরং প্রকৃতির অংশ মনে করে। পঞ্চকোষ ভিত্তিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সচেতন ও স্থায়ী জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হতে উদ্বুদ্ধ করে। □

ক্ষণস্থায়ী সুবিধার জন্য প্ল্যাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহার দীর্ঘস্থায়ী বিপদ ডেকে আনছে

কারণ প্লাস্টিক জল-বাতাস ও রৌদ্রতাপে অন্যান্য বস্তুর মতো নষ্ট হয় না। বরং সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ও তাপে প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগগুলি ভেঙে ভেঙে ছোটো ছোটো অজস্র কণায় রূপান্তরিত হয় যা খালি চোখে দেখা যায় না। বিজ্ঞানীদের ভাষায়, এগুলি মাইক্রোপ্লাস্টিক বা ন্যানোপ্লাস্টিক। এই কণাগুলি আকারে ৫ মিলিমিটারের চেয়েও ছোটো হয়। নদী, পুকুর, সমুদ্রের জল, মাটি, এমনকী বাতাসেও মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলছে।

সঞ্জিতকুমার সাহা

হ্যাঁ, আপনি হয়তো ঠিকই ধরেছেন। আমি একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগের কথা বলছি। আপনি সকালবেলা বাজারে গেলেন, মাছ কিনলেন, সবজি কিনলেন, মুদিখানা থেকে আরও কিছু জিনিস কিনলেন। সবাই সবকিছু আলাদা আলাদা প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগে ভরে দিল। আপনি এগুলি নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। বাড়ি ফিরে ক্যারিব্যাগের ভিতরের জিনিসগুলি বের করে ব্যাগটি অত্যন্ত অবহেলায় আপনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এগুলির কিছু জায়গা হলো আস্তাকুঁড়ে, ডাস্টবিনে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যার প্রয়োজন শেষ, কিন্তু তার অস্তিত্ব শেষ হলো না। কিছু হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে উড়ে গিয়ে পড়ল নর্দমায়, কিছু মাটিতে, কিছু জলাজংলায়। বলা যায়, সেখান থেকেই শুরু হলো তার দীর্ঘ যাত্রা— নর্দমা, খাল, নদী, জলাভূমি পেরিয়ে কখনো সমুদ্রের দিকে, কখনো মাটির গভীরে।

একবার ভাবুন তো প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগটি নিয়ে। একে একবার ব্যবহার করেই ছুঁড়ে ফেলে দিই। আমাদের কাছে এর ব্যবহার অতি ক্ষণস্থায়ী। প্লাস্টিকের ব্যাগটি আমাদের হাতে থাকে মাত্র কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘণ্টা কিন্তু এর পরিণতি? প্রকৃতি-পরিবেশে এর রেশ থেকে যায় বহু, বহু-বছর। কারণ এর ক্ষয় নেই। মাটিতে মিশেও যায় না। জলেও পচে না। সেজন্যই একবার ব্যবহার করা প্লাস্টিক ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে। সামান্য বৃষ্টিতেই তাই নগরবাসীকে জলে ভাসতে হয়। কারণ নর্দমায় দিনের পর দিন ক্যারিব্যাগ জমে জলনিকাশে বাধা সৃষ্টি করে, আর সেজন্যই রাস্তাঘাটে জল জমে নগরবাসীর প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তোলে।

আমাদের দেশের ভূ-প্রকৃতিতে যেমন আছে পাহাড়-জঙ্গল, তেমনি আছে অগণিত জলধারা। জলধারাগুলি শুধু জল বহন করে না, বহন করে মানুষের জীবন, কৃষি ও জীববৈচিত্র্যও। সেখানে যদি প্রতিদিন লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি প্লাস্টিকের প্যাকেট, প্লাস্টিকের বোতল ও প্লাস্টিকজাত নানা ধরনের বর্জ্য জমতে থাকে, তাহলে তার প্রভাব শুধু জলাধারে পড়ে না, প্রভাব পড়ে জলজ প্রাণী ও সমগ্র বাস্তুতন্ত্রেও। ক্ষতিগ্রস্ত হয় সমগ্র জীবকুল। কারণ একটি জলাধার শুধুমাত্র জলের আধার নয়, একে কেন্দ্র করে বেঁচে থাকে মাছ-কাঁকড়া-পাখি-সহ অসংখ্য জীব ও পোকামাকড়। প্রতিটি জলাধারকে ঘিরে থাকে এক জটিল বাস্তুতন্ত্র। জলাধারের চারপাশে থাকে অসংখ্য গাছপালা ও জঙ্গল যেখানে আশ্রয় নিয়ে থাকে কত ধরনের জীব-জানোয়ার। জলাধারে প্লাস্টিক-বর্জ্য জমতে থাকলে জলের ভেতরে বসবাসকারী জীবেরা যেমন বিপন্ন হয় তেমনি বিপন্নবোধ করে জলাধারের নিকটে থাকা জঙ্গলে আশ্রয়কারী ছোটোখাটো পোকামাকড়ও। অনেকে পরিবর্তীত পরিস্থিতিতে টিকতে না পেরে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করে। হারিয়ে যায় কত প্রজাতি। আমাদের একবার ব্যবহার করা প্লাস্টিকে ভাবুন তো কত বিপদ লুকিয়ে থাকে।

একবার ব্যবহার করে ছুঁড়ে ফেলা প্লাস্টিক সমাগ্রিকভাবে গাছ ও জীবের পরিবেশগত ঝুঁকি ও বিপদ দুই বাড়াতে সাহায্য করে। আবার উলটোদিকে প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ হালকা, সস্তা, সহজে বহনযোগ্য, জলরোধী সেকারণেই এর ব্যবহার এত ব্যাপক। চিকিৎসা থেকে কৃষি, খাদ্য সংরক্ষণ থেকে শিল্প, পরিবহণ থেকে প্রযুক্তি— প্রায় সর্বত্র প্লাস্টিকের ব্যবহার রয়েছে। সমস্যা

প্লাস্টিকে নয়, এর সমস্যা একবার ব্যবহার করা প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগের ব্যবহারে। ক্যারিব্যাগ যে শুধু জল ও জলের আধারে বসবাসকারী জীবকুলের ক্ষতি করে তা শুধু নয়, মাঠে বা মাটিতে ছড়িয়ে থাকা প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগগুলোও কম ক্ষতিকর নয়। মাটিতেও যেহেতু এর বিনাশ হয় না সেজন্য বলতে দ্বিধা নেই, মাটির গভীরে প্রবেশ করে মাটির গুণগত মানও খারাপ করে দেয়। মাটি অনুর্বর হয়। একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগের ব্যবহার বন্ধে, ভারত সরকারের দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ২০২২ সালের ১ জুলাই থেকে নির্দিষ্ট কয়েকটি সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক সামগ্রীর উৎপাদন, আমদানি, মজুত, বিতরণ, বিক্রি ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে প্লাস্টিকের স্টিকযুক্ত ইয়ারবাড, বেলুন ও ক্যান্ডির স্টিক, প্লাস্টিকের পতাকা, আইসক্রিম স্টিক, প্লেট, কাপ, গ্লাস, কাঁটা-চামচ, ছুরি, ট্রে, স্ট্র, নাড়ার স্টিক এবং কিছু ধরনের প্যাকেজিং ও সাজসজ্জার সামগ্রী। তথাপি ব্যবহার বন্ধ হয়নি। পূজার সময়। প্রতি পূজা-প্যাণ্ডেলের ধারে-কাছে গড়ে উঠবে অস্থায়ী অজস্র খাবারের দোকান। ব্যবহার বাড়বে প্লাস্টিক ও থার্মোকলের। রাস্তায় এবং আশেপাশে দিনের শেষে গড়াগড়ি খাবে নিষিদ্ধ প্লাস্টিকের ব্যাগ, প্লাস্টিকের গ্লাস-প্লেট-চামচ ও খাবারের প্যাকেট।

এই আইন আমাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও তুলে ধরে। সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে, প্রশাসন নজরদারি করতে পারে, জরিমানা করতে পারে, কিন্তু একজন ক্রেতা যদি দোকানে গিয়ে প্রতিবার প্লাস্টিকের ব্যাগ চান, তাহলে সমস্যার শিকড়ে পৌঁছনো কঠিন। হয়েছেও তাই। ভারতের এই বৃহত্তর চিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ পশ্চিমবঙ্গ। আমাদের রাজ্যে প্লাস্টিকের ব্যবহার ও বর্জ্যের সমস্যা চোখে পড়ে শহর থেকে গ্রাম সর্বত্র। বিশেষভাবে চোখে পড়ে হাট-বাজার, পর্যটনকেন্দ্র, নদী-খাল-জলাশয় ও খোলা মাঠে। কলকাতা থেকে শুরু করে জেলা শহর, পুরসভা এলাকা থেকে গ্রামীণ হাটগুলি প্লাস্টিকের প্যাকেট এবং একবার ব্যবহারযোগ্য সামগ্রীতে ভরে উঠেছে, এগুলি এখন দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখন স্বভাবতই সকল নাগরিকের কাছে প্রশ্ন : প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগের ব্যবহার বন্ধ করবেন কেন?

কারণ প্লাস্টিক জল-বাতাস ও রৌদ্রতাপে অন্যান্য বস্তুর মতো নষ্ট হয় না। বরং সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ও তাপে প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগগুলি ভেঙে ভেঙে ছোটো ছোটো অজস্র কণায় রূপান্তরিত হয় যা খালি চোখে দেখা যায় না। বিজ্ঞানীদের ভাষায়, এগুলি মাইক্রোপ্লাস্টিক বা ন্যানোপ্লাস্টিক। এই কণাগুলি আকারে ৫ মিলিমিটারের চেয়েও ছোটো হয়। নদী, পুকুর, সমুদ্রের জল, মাটি, এমনকী বাতাসেও মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলছে। এগুলি জলজ প্রাণীদের জন্য খুবই বিপজ্জনক মানুষের জন্যও। কারণ জলজ প্রাণী বিশেষ করে মাছ, কাঁকড়া আমাদের প্রিয় খাদ্য। এগুলিতে ন্যানোপ্লাস্টিক মিশে থাকলে তা আমরাও খেয়ে ফেলছি। সেজন্য জটিল দুরারোগ্য ব্যাধির শিকার হওয়া অস্বাভাবিক নয়, হচ্ছিও। উপরন্তু এই কণাগুলি খাদ্যশৃঙ্খলের বিভিন্ন স্তরে প্রবেশ করে আমাদের অজান্তে বড়োসড়ো বিপদ ঘটাচ্ছে— যা আমরা টেরও পাই না।

এবারে আবার প্রশ্ন : আমরা কি তবে প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ বন্ধ করব না?

অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। সেজন্য আমাদের অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। বিশেষ করে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিককে 'না বলা', 'টা-টা বাই-বাই' করতেই হবে। কারণ প্লাস্টিক বর্জ্যের ৪৩ ভাগই একবার ব্যবহার করা পাতলা প্লাস্টিক। পরিবর্তে কাপড়ের ব্যাগ, চটের ব্যাগ, কাগজের ব্যাগ ব্যবহার করতে হবে। মুদিখানা দোকানে কাগজের ঠোঙা, স্কুলে শিশুদের একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকে টিফিন না দেওয়া, খাদ্য সংরক্ষণে প্লাস্টিকের ব্যবহার না করার অভ্যাস করতে হবে। কারণ খাবারে প্লাস্টিকের কণা মিশে গেলে ক্ষতি আমাদেরই।

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদও একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের উৎপাদন, আমদানি, মজুত, বিক্রি ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। সেও অনেকদিন হয়ে গেল। ১২০ মাইক্রনের কম ঘনত্বের প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ যাতে কেউ ব্যবহার না করে সে-বিষয়ে বারবার বলা সত্ত্বেও এখনও তা রমরম করে চলছে। শুধু তাই নয়, প্লাস্টিকের বোতলের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। প্লাস্টিকের বোতলের জলেও ক্ষতিকর প্লাস্টিক কণা মিশে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। প্লাস্টিকের বোতলে জল না পান করে, পুনর্ব্যবহারযোগ্য বোতলে জল রাখা শ্রেয়।

একবার পাহাড়-অঞ্চলের কথা ভাবুন। পাহাড় কিংবা সমুদ্রতীরে পর্যটকদের সংখ্যা যেমন দিন দিন বেড়ে চলেছে, তেমনি বাড়ছে প্লাস্টিকের বর্জ্য। পর্যটকের হাতে থাকা জলের বোতল, খাবারের প্যাকেট বা প্লাস্টিকের মোড়ক অনেক সময়েই নির্দিষ্ট জায়গায় না ফেলে বাতাসে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এতে পাহাড়ি-পরিবেশে ঝুঁকি বাড়ে। পাহাড়ে একটি প্লাস্টিকের প্যাকেট হয়তো পর্যটকদের কাছে ছোট্টো একটি বস্তু কিন্তু হাজার হাজার পর্যটকের ফেলে যাওয়া একই ধরনের বস্তু যে পরে পরিবেশগত বহৎ সমস্যায় পরিণত হয়। শুধু তো পর্যটন কেন্দ্র নয়, ঝুঁকি বাড়ায় সামাজিক জীবনের অংশ দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা, মেলা কিংবা পাড়ার অনুষ্ঠানের পরে ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকে প্যাকেট ও অন্যান্য বস্তুতেও। অনুষ্ঠান শেষে যদি মাঠ, রাস্তা বা জলাশয়ের পাশে প্লাস্টিকের গ্লাস, প্লেট, চামচ ও খাবারের প্যাকেট পড়ে থাকে, তাহলে উৎসবের আনন্দের সঙ্গে পরিবেশের উপরও একটি বিশাল বোঝা তৈরি হয়। পুনর্ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী ব্যবহার করলে সেই বোঝা অনেকটাই কমানো সম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারও চায়, প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে মিলিতভাবে সকলকে। বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতা, বাড়ির মানুষ, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, পুরসভা, পঞ্চায়েত, প্রশাসন, উৎপাদক এবং ব্যবরাকারী সাধারণ আম-জনতার সম্মিলিত দায়িত্ব, অভ্যাসের বদল ঘটানো। এজন্য দরকার ব্যক্তি-সচেতনতা, আইন ও প্রশাসনিক উদ্যোগ। মনে রাখতে হবে, ক্যারিব্যাগের ব্যবহার ক্ষণস্থায়ী কিন্তু বিপদ দীর্ঘস্থায়ী। □

গবেষণা ও আবিষ্কারে ভারতের নারী

অরুণা রায় চৌধুরী

একসময় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গবেষণার জগৎকে মূলত পুরুষদের ক্ষেত্র হিসেবেই দেখা হতো। কিন্তু আজকের ভারত সেই ধারণাকে দ্রুত বদলে দিচ্ছে। গবেষণাগার থেকে মহাকাশ, চিকিৎসাবিজ্ঞান থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, পরমাণু বিজ্ঞান থেকে নতুন প্রযুক্তির পেটেন্ট প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারতীয় নারীরা নিজেদের মেধা, দক্ষতা ও নেতৃত্বের স্বাক্ষর রাখছেন।

All India Survey on Higher Education (AISHE) - 2021-22) অনুযায়ী, ভারতে STEM অর্থাৎ Science, Technology, Engineering and Mathematics বিষয়ে উচ্চশিক্ষায় মোট ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৪৩ শতাংশই নারী। একই সময়ে STEM-এ PhD-তে নারীদের অংশগ্রহণ প্রায় ৪১ শতাংশ অর্থাৎ ভবিষ্যতের গবেষক ও বিজ্ঞানীদের ভিত তৈরি হচ্ছে ক্রমশ আরও বেশি সংখ্যক ভারতীয় নারীর হাতে। তবে উচ্চশিক্ষার এই সাফল্যের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে গবেষণার অংশগ্রহণের ব্যবধান এখনও রয়েছে।

Department of Science & Technology-এর তথ্য অনুযায়ী ২০২০-২১ সালে ভারতের R & D বা STEM গবেষণা কর্মশক্তিতে মহিলাদের অংশ ছিল ১৮.৬ শতাংশ। সর্বশেষ সরকারি তথ্য অনুযায়ী ২০২৩-২৪ সালে এই অংশগ্রহণ বেড়ে ২৯ শতাংশে পৌঁছেছে যা দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত। ২০০০-০১ সালে এই হার ছিল মাত্র ১৩ শতাংশ।

শুধু গবেষণায় অংশগ্রহণ নয়, নেতৃত্বেও নারীরা এগিয়ে আসছেন। সরকারি তথ্য অনুযায়ী ২০২২-২৩ সালে DST-এর অর্থায়নে পরিচালিত Extramural R & D প্রকল্পগুলিতে নারী Principal Investigator-এর অংশগ্রহণ ৩০ শতাংশ পৌঁছেছে। ওই বছর ১২৮৯ জন নারী Principal Investigator গবেষণা সহায়তা পেয়েছেন।

আবিষ্কার ও মেধাস্বত্বের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন স্পষ্ট। WIPO-এর তথ্য বলছে, বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক PCT পেটেন্ট আবেদনে নারী উদ্ভাবকদের অংশ ২০১০ সালের ১১.৬ শতাংশ থেকে ২০২৪ সালে বেড়ে ১৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০২৪ সালে প্রকাশিত PCT আবেদনের প্রায় ৩৭ শতাংশ অন্তত একজন নারী উদ্ভাবকের নাম ছিল। ভারতের ক্ষেত্রে ২০২৩ সালের WIPO বিশ্লেষণ আন্তর্জাতিক পেটেন্টে নারী উদ্ভাবকের অংশ ছিল মোটামুটি ১০ শতাংশের কাছাকাছি অর্থাৎ সুযোগ বাড়লেও এই ক্ষেত্রে আরও অনেক দূর এগোনোর সম্ভাবনা রয়েছে।

নারীদের সাফল্য শুধু পরিসংখ্যানে সীমাবদ্ধ নয়। চন্দ্রযান ২ ও চন্দ্রযান ৩-এর মতো ভারতের মহাকাশ অভিযানে বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বহু নারী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। রিতু করিধাল, এম. ভানিতা-সহ বহু নারী বিজ্ঞানী ভারতের মহাকাশ গবেষণাকে সাধারণ মানুষের কাছে নতুন অনুপ্রেরণার প্রতীক করে তুলেছেন। তাঁদের সাফল্য দেখিয়ে দিয়েছে বিজ্ঞানে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা লিঙ্গনির্ভর নয়, নির্ভর করে মেধা, পরিশ্রম ও সুযোগের উপর।

চিকিৎসা ও জীববিজ্ঞানের গবেষণাতেও ভারতীয় নারীরা আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের অবস্থান তৈরি করেছেন। টিকা, সংক্রামক রোগ, জিনতত্ত্ব, জনস্বাস্থ্য ও বায়োটেকনোলজীর মতো ক্ষেত্রে নারী গবেষকদের অবদান ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও WIPO-এর পরিসংখ্যান দেখায় নারী উদ্ভাবকদের অংশগ্রহণ pharmaceuticals ও biotechnology-র মতো ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বেশি। এই অগ্রগতির পেছনে সরকারি উদ্যোগও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। WISE KIRAN-এর মতো কর্মসূচির মাধ্যমে ইতিমধ্যে ৪০০০-এর বেশি নারী বিজ্ঞানী গবেষণা সহায়তা পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৯৪২ জনকে Intellectual Property Rights-এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং ৪১৩ জন নিবন্ধিত patent agent হয়েছেন। BioCARe-এর মাধ্যমে কর্মজীবনে বিরতির পর ৪১৫ জন নারী গবেষককে পুনরায় গবেষণায় ফিরতে সহায়তা করা হয়েছে।

তবু পথ পুরোপুরি মসৃণ নয়। গবেষণায় উচ্চ পদে নারীর প্রতিনিধিত্ব এখনও তুলনামূলকভাবে কম। কর্মজীবনে বিরতি, পারিবারিক দায়িত্ব, পর্যাপ্ত mentorship-এর অভাব এবং নেতৃত্বের সুযোগে বৈষম্য, এই বাধাগুলি এখনও রয়েছে। তাই শুধু STEM-এ মেয়েদের প্রবেশ বাড়ালেই হবে না, তাঁদের গবেষণার শেষ ধাপ পর্যন্ত ধরে রাখা এবং নেতৃত্বের আসনে পৌঁছানোর সুযোগও নিশ্চিত করতে হবে।

ভারতের নারী আজ আর শুধু বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী নন, তিনি গবেষক, উদ্ভাবক, প্রযুক্তিবিদ এবং নেতৃত্বদাত্রী। ৪৩ শতাংশ STEM-এ মেয়েদের প্রবেশ বাড়ালেই হবে না, তাঁদের গবেষণার শেষ ধাপ পর্যন্ত ধরে রাখা ও নেতৃত্বের আসনে পৌঁছানোর সুযোগও নিশ্চিত করতে হবে।

ভারতের নারী আজ আর শুধু বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী নন, তিনি গবেষক, উদ্ভাবক, প্রযুক্তিবিদ এবং নেতৃত্বদাত্রী ৪৩ শতাংশ STEM শিক্ষার্থী থেকে ক্রমবর্ধমান নারী গবেষক এবং আন্তর্জাতিক পেটেন্টে বাড়তে থাকা নারী উদ্ভাবকের উপস্থিতি প্রমাণ করে, ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ আরও বেশি নারী-নির্ভর হয়ে উঠছে।

যে ভারত একদিন বলতো, 'মেয়েরা বিজ্ঞান করবে?' সেই ভারত আজ গর্বের সঙ্গে বলতে পারে 'ভারতের বিজ্ঞান এগোবে নারীর হাত ধরেই।'

□

কোন রোগে কোন খাবার

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

ঘরের তৈরি খাবার অসুস্থ মানুষ যখন খায়, সেটাই হয়ে যায় পথ্য। যে কোনো অত্যধিক তেলমশলা যুক্ত খাবার, বাইরের ভাজাভুজি, জাঙ্ক ফুড এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর তৈরি খাবার শরীরের পক্ষে ভালো নয়।

পথ্যের গোড়ার কথা : চরক-সুশ্রুত-বাগভট্ট-চক্রদত্ত আকর গ্রন্থে বায়ু-পিত্ত-কফের বিচারে রোগ-ওষুধ-পথ্য নির্বাচিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে— স্থান-কাল-পাত্র-বয়স-প্রকৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব-রোগীর জীবনীশক্তি প্রভৃতির বিচার-বিশ্লেষণ করে পথ্যাপথ্য বিচার করতে হবে। এভাবেই দীর্ঘকাল চলছিল। ভালো-মন্দ বিচার করে অদলবদল হচ্ছিল। পেনসিলিন আবিষ্কারের পর থেকে শুরু হয়ে গেল আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি। বিশ্বের জন্য এই আবিষ্কারের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমরা মানুষকে সতর্ক করতে পারিনি, পারিনি ধূর্ত ব্যবসায়ীদের ঠেকিয়ে রাখতে, পারিনি কৃষিবিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান প্রভৃতির আবিষ্কারের সঙ্গে চিকিৎসা বিজ্ঞানের মেলবন্ধন ঘটাতে, এলোমেলো হয়ে গেল সবকিছু, তারই খেসারত দিতে হচ্ছে মানুষকে।

১. পথ্য বা খাদ্য তৈরির জন্য আহার্য দ্রব্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ : শাকসবজি, মরশুমি পাকা ফল, দুধ ও দুধ থেকে তৈরি দ্রব্যাদি, নানাপ্রকারের মিষ্টি, মাছ-মাংস-ডিম, মশলাপাতি, ভোজ্য তেল, পানীয় জল প্রভতি সংগ্রহ করা এবং সংরক্ষণ করা দরকার। চারদিকে নানাভাবে ভেজালের রমরমা, বিষাক্ত দ্রব্যের মিশ্রণ— এসব থেকে সাবধান হয়ে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করুন এবং সেগুলি কাচ বা স্টিলের পাত্রে রাখুন।

২. খাদ্য প্রস্তুতের আগে কিছু সতর্কবার্তা : সেদ্ধ চাল ভাতের পক্ষে শ্রেয়। মেশিনে চালানো কাঠের ঢেঁকিতে এখন কোথাও কোথাও চাল তৈরি হচ্ছে। যোগাযোগ করে আপাতত রোগীর জন্য কিছুটা চাল সংগ্রহ করতে পারেন। যে চালই হোক, ৫ গুণ জলে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখার পর ভালো করে ধুয়ে রান্না করুন।

(ক) আর্সেনিক ও আয়রনমুক্ত ফিল্টারের জল পান করুন।

(খ) ডিম সংগ্রহের পর ভালোভাবে ধুয়ে ঝুড়িতে রাখুন।

(গ) ডাল ৫ গুণ জলে ১০-১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখার পর ধুয়ে রাধুঁন।

(ঘ) বড়ি বা আচার ভালোভাবে সংরক্ষণ করুন। মাঝে মাঝে রোদে দিন। ঢাকনা ভালোভাবে বন্ধ করবেন। ছাতা পড়লে ফেলে দিন।

(ঙ) শুকনো লঙ্কার ভেতরে ছাতা পড়ে। রান্নার আগে ভেঙে দেখে নিন। ছাতা পড়া শুরু হলে সবটাই ফেলে দিন।

(চ) শুঁটকি মাছ খেতে চাইলে টাটকা মাছ এনে কেটেকুটে ভালোভাবে ধুয়ে নুন মাখিয়ে রোদে শুকিয়ে নিন। বিশেষ গুণ না থাকলেও অরুচিনাশক, মুখরোচক, তৃপ্তিকারক।

(ছ) স্যালাড খেলে নুন ও লেবুর রসে মিশিয়ে খাবেন। কাঁচা টম্যাটো খাবেন না।

(জ) আপেল, শসা, নাশপাতি প্রভৃতি ভালোভাবে ধুয়ে খাবেন। খোসা ছাড়াবেন না।

(ঞ) ভালোভাবে না পাকলে কলা খেতে নেই। দুধ বা দইয়ের সঙ্গে কলা খাবেন না। দু'ঘণ্টা ব্যবধানে খান।

(ট) ডাবের জলে সোডিয়াম ও পটাশিয়াম খুব বেশি থাকায় যাঁদের প্রেশার কম কিংবা রক্তে এই দু'টি উপাদান কম মাত্রায় আছে, তাঁরা ২০০/২৫০ মিলি ডাবের জল প্রত্যহ খেতে পারেন। কিডনির রোগে আক্রান্ত হলে ডাবের জল নিষিদ্ধ। কিডনির সাধারণ রোগে খাওয়া যেতে পারে চিকিৎসকের পরামর্শ মতো। জলটি খুব বেশি মিষ্টি হলে মধুমেহ আক্রান্ত ব্যক্তিরা খাবেন না।

(ঠ) ওল, কচু, মানকচু, খাম আলু খেতে হলে নুন দিয়ে ভালোভাবে সেদ্ধ করে জল ফেলে দিয়ে রান্না করা উচিত। সরষে বাটা ব্যবহার করবেন না। পরিবর্তে চারমগজের দানা, কুমড়োর দানা, পোস্ত প্রভৃতি সামান্য পরিমাণে মেশাতে পারেন। পোস্তর পরিবর্তে সাদা তিল বেটে বা ভেজে খেতে পারেন। কাজু বা চিনেবাদাম সামান্য মেশালেও চলবে। ডায়াবেটিসের রোগী ও ইউরিক অ্যাসিডে আক্রান্ত হলে এই সব দ্রব্য খাবেন না।

(ড) শাকসবজি হালকা ভাপিয়ে জল ফেলে রান্না করা উচিত। তবে থোড়, লাল নটে, বেতো শাক, সজনে পাতা, গাঁদাল পাতা, ব্রাহ্মীশাক, থানকুনি, তেলাকুচা শাক, হেলেঞ্চা শাক, মেথিশাক, শুসনি শাক প্রভৃতি সেদ্ধ করে জল ফেলতে নেই। গিমে শাক, কুলেখাঁড়া শাক প্রভৃতি হালকা নুন জলে ভালোভাবে চটকে ধুয়ে রান্না করুন। ব্রাহ্মীশাক ভালো মাটি ও গোবর সার দিয়ে টবে চাষ করে খেতে পারলে ভালো। শাকটি মাটিতে থাকা বিশাক্ত রাসায়নিক (আর্সেনিক প্রভৃতি) সহজে টেনে নিতে পারে। পালং শাক কাটার পর গরম জলে আধ মিনিটের মতো রেখে তুলে নিয়ে রান্না করুন। কুমড়ো, মোচা, কলা, বেগুন, উচ্ছে হালকা ভাপিয়ে জল ফেলে দিয়ে রান্না করুন। ফুলকপি ও বাধাঁকপি নুন ও হলুদ মিশ্রিত জলে ভালোভাবে ভাপিয়ে জল ঝরিয়ে রান্না করবেন। রাস্তার ধারে বসা দোকান থেকে শাকসবজি কিনলে একবারের জায়গায় ২ বার ভালোভাবে ধুয়ে নিন। কারণ পেট্রল ও ডিজেল চালিত গাড়ির ধোঁয়া লাগার ফলে সেগুলি বিষাক্ত হয়ে যায়।

(ঢ) কাঁচা পেঁপের তরকারিতে উচ্ছে ও টম্যাটো দিয়ে রান্না করবেন না।

(ণ) মাছ-মাংস-ডিমের যেকোনো একটি রান্না দিয়ে ভাত বা রুটি খান। একসঙ্গে ২টি বা ৩টি খাবেন না।

(ত) রং করা শাকসবজি, মাছ, মিষ্টি দ্রব্য কারওরই খাওয়া উচিত নয়। দেখেশুনে বাজার করবেন। আমিষ খাবার খাওয়ার পর দুধ বা দুধ জাতীয় কোনো খাবার ঘণ্টা চারেকের মধ্যে খাবেন না।

(থ) মিষ্টি দই না খেয়ে টক দই খান। ঘরে পাতা হলে অধিক ভালো।

(দ) আদা ও রশুন বাটা দিয়ে কোনো রান্না না করাই উচিত। □

শিলিগুড়িতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মার্গদর্শকমণ্ডলীর বৈঠক



আধ্যাত্মিক ভাবগাম্ভীর্য ও সনাতন সমাজকে সুসংগঠিত করার সুদৃঢ় সংকল্পের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হলো বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত মার্গদর্শকমণ্ডলীর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। গত ২২ আগস্ট শিলিগুড়ি-স্থিত ইসকনের শ্রীশ্রীরাধামাধব সুন্দর মন্দির প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই সভায় উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ প্রান্ত থেকে সাধুসন্ত ও ধর্মাচার্যদের এক অভূতপূর্ব সমাবেশ ঘটে।

এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় বৈদিক ঐতিহ্য মেনে গুরুকুলের ছাত্রীদের সুরেলা ও মাঙ্গলিক ভজন-কীর্তনের মধ্য দিয়ে। সাদা পোশাকে সজ্জিত ছাত্রীদের পরিবেশিত ভক্তিগীতি সমগ্র সভাকক্ষে এক দিব্য ও স্নিগ্ধ পরিবেশের সৃষ্টি করে। এরপর ইসকন মন্দিরের মূল সভাকক্ষে 'ইউ'-আকৃতিতে সজ্জিত বিশেষ মঞ্চে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন মঠ, মন্দির, আশ্রম ও আখড়া থেকে আগত শতাধিক প্রবীণ ও নবীন সাধুসন্ত, মোহন্ত ও শীর্ষ ধর্মাচার্যরা তাঁদের আসন গ্রহণ করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন পূজনীয় শ্রীমৎ নির্গুণানন্দজী মহারাজ প্রমুখ বরেণ্য সাধুসন্ত ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বরিষ্ঠ কার্যকর্তারা।

বৈঠকে সনাতন সমাজের বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্ধারণের লক্ষ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে বেশ কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরাকে আধুনিক প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া, সনাতন মূল্যবোধে সমৃদ্ধ ঐতিহ্যবাহী গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন, গ্রামীণ অর্থনীতি ও পরিবেশ সুরক্ষায় গোশালা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও গো-সেবার বিস্তার এবং প্রতিটি প্রত্যন্ত গ্রামে সৎসঙ্গ সপ্তাহ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে ব্যাপক ধর্ম জাগরণ অভিযান পরিচালনা করা। উপস্থিত সন্তরা স্পষ্ট বার্তা দেন যে, জাতীয় মূল্যবোধ ও মানবিক অবক্ষয় রোধে আধ্যাত্মিকতার প্রচারই একমাত্র পথ। সভায় আগামী কর্মসূচি প্রসঙ্গে ঘোষণা করা হয় যে, পরম শ্রদ্ধেয় অশোক সিঙ্ঘলজীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ২৭ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়িতে একটি ঐতিহাসিক ও সুবিশাল সন্ত সম্মেলন আয়োজিত হবে। এছাড়াও সন্ত শিরোমণি রবিদাসজীর ৬৫০তম জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র আবির্ভাব তিথি জন্মাষ্টমীকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে বিশ্বজুড়ে মহাসমারোহে পালনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সমাবেশে উপস্থিত সন্তসমাজ সনাতন সংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষা ও সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ধারাবাহিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান এবং আগামী প্রতিটি পদক্ষেপে সক্রিয় ও সর্বাত্মক সহযোগিতার দৃঢ় আশ্বাস প্রদান করেন।





অশোক সিঙ্ঘলজীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে কলকাতায় ‘হিন্দু সম্মেলন’





বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অন্যতম প্রাণপুরুষ ও হিন্দু হৃদয় সম্রাট অশোক সিঙ্ঘলজীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে সমগ্র ভারতের সঙ্গে এরাজ্যেও ‘হিন্দু সম্মেলন’ অনুষ্ঠিত হয়। গত ৪ অক্টোবর কলকাতা-স্থিত উত্তীর্ণ সভাগৃহে এই হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে এবং কলকাতা ও হাওড়া মহানগরের প্রায় পাঁচ হাজারের বেশি কার্যকর্তা ও নাগরিক এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। উত্তীর্ণ সভাগৃহের সমগ্র পরিসরে অশোক সিঙ্ঘলজীর বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি ও জীবনের বিভিন্ন দিক প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। সুসজ্জিত সভাগৃহে আয়োজিত এই সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সুপ্রিম কোর্টের প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী শ্রী অলোক কুমারজী। সম্মেলনে ছিল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়ের গৌরবময় উপস্থিতি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কলকাতা ক্ষেত্রে সম্পাদক অমিয় সরকার ও প্রমুখ সাধুসন্তরা। সম্মেলনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও বিবিধ ক্ষেত্রের বরিষ্ঠ কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সকল বিশিষ্ট অতিথিকে প্রথমে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)-এর পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। প্রথমে ক্ষেত্র সম্পাদক তাঁর বক্তব্য রাখেন। মঞ্চে উপস্থিত রিষড়া প্রেম মন্দির আশ্রমের সম্পাদক শ্রীমৎ নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ ও মহানাম অঙ্গনের সম্পাদক শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী মহারাজ অশোক সিঙ্ঘলজী সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য রাখেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-পূর্বক্ষেত্র প্রচারক জলধর মাহাত তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এরপর সম্মেলনের প্রধান বক্তা শ্রী অলোক কুমারজী তাঁর বক্তব্যে অশোকজীর জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণের প্রথম দিকে করসেবার সময় রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁর নেতৃত্বদান, গঙ্গাদূষণ প্রতিরোধে তাঁর ভূমিকা, সংস্কৃত ভাষার পুনরুজ্জীবন, গো-রক্ষা, গুরুকুল ও হিন্দুসমাজের মধ্যে অস্পৃশ্যতা ও বিভাজন দূর করার জন্য সামাজিক সমরসতার কাজ শুরুর ক্ষেত্রে অশোকজীর অবদান অলোক কুমারজী স্মরণ করেন। আগামীদিনে কাশী ও মথুরা— এই দুই ধর্মস্থান বিধর্মীদের হাত থেকে মুক্ত হবে এই বার্তা তিনি দেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গকে হিন্দুত্ব ও জাতীয়তাবোধের পীঠস্থান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প ঘোষণা করেন। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রবাদী কার্যক্রমে রাজ্য সরকারের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান।

সম্মেলনে উপস্থিত সকলের উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত) সভাপতি ও কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী সুবীর সান্যাল। সম্মেলন শেষে সমবেতভাবে ‘বন্দে মাতরম্’ গাওয়া হয়। সভা শেষে সকলকে ভোজনে আপ্যায়িত করা হয়। সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন উপস্থিত সকলের মধ্যে বিশেষ প্রেরণার সৃষ্টি করে।


प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban
नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री
मध्यप्रदेश
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
के उत्कृष्ट क्रियान्वयन में
देश में प्रथम
1 NUMBER ONE PMAYU
98.04%
ग्राउंडिंग के साथ
देश में प्रथम
10 लाख+
आवास स्वीकृत
9 लाख+
आवास पूर्ण एवं
हितग्राहियों को
वितरित
पक्का घर बन रहा है
सशक्त और सुरक्षित जीवन का आधार
अपने सपनों का घर पाने के लिए आज ही ऑनलाइन आवेदन करें।
अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.pmay-urban.gov.in
स्कैन QR कोड
नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश
@pmayurbanmp

आस्था का दिव्य महाकुंभ

पूरा विश्व देखेगा उज्जैन का वैभव



नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

30 करोड़ श्रद्धालुओं का स्वागत
उज्जैन नगरी का हो रहा अभूतपूर्व कायाकल्प

सुगम आवागमन ₹ 13,536 करोड़ से 581 कि.मी. मार्गों का चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य प्रगतिरत

पुल निर्माण ₹440 करोड़ के निर्माण से यातायात का बेहतर प्रबंधन

शुद्ध जल क्षिप्रा के लिये ₹ 919 करोड़ लागत की कान्ह क्लोज्ड डक्ट परियोजना एवं शहर में पेयजल आपूर्ति हेतु ₹1113 करोड़ के कार्य जारी

घाट निर्माण लगभग 29 कि.मी. घाटों का निर्माण जारी

ज़ीरो वेस्ट इवेंट जन भागीदारी से ज़ीरो वेस्ट इवेंट बनाने की पहल

मंदिरों का जीर्णोद्धार
सभी पौराणिक मंदिर जैसे हरसिद्धि, गढ़कालिका का विकास

आधुनिक तकनीक से प्रबंधन
भीड़ नियंत्रण से लेकर ट्रांसपोर्ट और कंट्रोल रूम तक एआई का उपयोग

कनेक्टिविटी विश्वस्तरीय उज्जैन हवाई अड्डा और सदावल में 4 हेलीपैड का निर्माण कार्य जारी

उज्जैन बनेगा मेडिकल हब
₹ 592.30 करोड़ लागत से मेडिसिटी एवं मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन



"सिंहस्थ महापर्व 2028 करोड़ों भक्तों को सरल, सुलभ और नवीनतम सुविधाओं से युक्त विश्व-स्तरीय कुंभ का अनुभव प्रदान करना हमारा संकल्प है।"

- डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश में पर्यटन का नया अध्याय







पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा

तेज, सुरक्षित और यादगार यात्रा का अनूठा अनुभव



भोपाल
झीलों की नगरी, मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल आधुनिक शहरी विकास और सांस्कृतिक विरासत का केन्द्र

ओरछा
यहां भगवान राम स्वयं इस नगर के राजा के रूप में विराजे हैं



चंदेरी
प्राचीन किलों और हथकरघा चंदेरी साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध

जबलपुर
भेड़ाघाट की संगमरमर की घाटी, धुआंधार जलप्रपात और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्वितीय अनुभव



मैहर
चित्रकूट पर्वत पर स्थित माँ शारदा देवी मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र

चित्रकूट
भगवान श्रीराम के वनवास से जुड़ा, आध्यात्मिक महत्व का अद्भुत स्थल



बांधवगढ़ नेशनल पार्क
सबसे अधिक संख्या में बाघों की उपस्थिति। प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन का अद्वितीय स्थल

कान्हा नेशनल पार्क
सबसे प्रसिद्ध टाइगर रिज़र्व समृद्ध वन्यजीव और जैवविविधता का गढ़





इंदौर
मध्यप्रदेश की व्यापारिक राजधानी होने के साथ-साथ स्वच्छता का सिरमौर इंदौर अपने राजवाड़ा सराफा और आधुनिक जीवन के लिए प्रसिद्ध है



उज्जैन
भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और सिंहस्थ कुंभ जैसे विशाल आध्यात्मिक आयोजन के लिए विश्वविख्यात



ओंकारेश्वर
ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन और अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव

आध्यात्मिक सर्किट

इंदौर - उज्जैन - ओंकारेश्वर - इंदौर	₹30,000
इंदौर - उज्जैन - इंदौर	₹14,500
इंदौर - ओंकारेश्वर - इंदौर	₹18,000

हेरिटेज सर्किट

भोपाल से चंदेरी	₹5,500	चंदेरी से ओरछा	₹2,750
भोपाल से ओरछा	₹6,500	जॉय राइड	₹3,500
भोपाल - ओरछा - भोपाल	(विशेष पैकेज)		₹14,500

वाइल्डलाइफ एवं आस्था सर्किट

जबलपुर - मैहर	₹5,000	जबलपुर - बांधवगढ़	₹6,500
जबलपुर - चित्रकूट	₹7,500	जबलपुर - कान्हा	₹6,000
मैहर - चित्रकूट	₹5,000	बांधवगढ़ - कान्हा	₹7,000



एक संपूर्ण यात्रा पैकेज

- गंतव्य स्थल पर ठहरने की व्यवस्था से लेकर भोजन, स्थानीय टैक्सी तक हर सुविधा का पैकेज
- मंदिर दर्शन की पूर्व निर्धारित व्यवस्था, पर्यटन अनुभव को और खास बनाने के लिए गाइड
- हेलीपैड तक पिक-अप और ड्रॉप की सुविधा

बुकिंग | www.flyola.in
air.irctc.co.in/flyola
www.transbharat.in


तकनीकी, प्रगति और सुशासन की
मिसाल बनीं नागरिक सेवाएं
सायबर तहसील देश में सबसे पहले लागू
सिर्फ 15 दिन में
सभी राजस्व कार्य ऑनलाइन
नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
संपदा 2.0 (ई-रजिस्ट्री)
अब घर बैठे पेपरलेस, फेसलेस संपत्ति पंजीयन
त्वरित नक्शे की अनुमति एवं ऑनलाइन डीम्ड अनुज्ञा
300 एवं 105 वर्ग मीटर तक के आवासीय भू-खण्डों पर
लोक सेवा गारंटी एक्ट
741 सेवाएं उपलब्ध,
10 करोड़ + आवेदनों का निराकरण
सीएम जनसेवा पोर्टल एप
दिव्यांगजनों के लिए
हेल्पलाइन
सीएम हेल्पलाइन 181
त्वरित और प्रभावी शिकायत निवारण
CM HELPLINE 181
डायल 112
16 मिनट में पहुंचने वाली
आपातकालीन सहायता
ई - ऑफिस
जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए
पारदर्शी एवं एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली
eOffice
हेल्पलाइन नम्बर - 1912, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में
विद्युत संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु
डॉ. मोहन यादव का अभ्युदय मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी
आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2026

‘রাম-শরদ কোঠারী প্রতিভা সম্মান-২০২৬’ প্রদান অনুষ্ঠান

১৯৯০ সালে অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমি করসেবা আন্দোলনে যোগদান করা বীর করসেবক ভ্রাতৃদ্বয় রাম কুমার কোঠারী ও শরদ কুমার কোঠারীর আত্মবলিদান স্মরণে প্রত্যেক বছরের মতো এবারও গত ২৬ সেপ্টেম্বর ‘রাম-শরদ কোঠারী স্মৃতি সঙ্ঘ, কলকাতা’র উদ্যোগে কলকাতা-স্থিত জাতীয় গ্রন্থাগারের সভাগৃহে ‘রাম-শরদ কোঠারী প্রতিভা সম্মান-২০২৬’ প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও উদ্যোগপতি শ্রী ললিত বেরীওয়াল। পুরুলিয়া অযোধ্যা পাহাড় অঞ্চলে শিক্ষাপ্রসারে অবদানের জন্য শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র হেমব্রম, গো-সেবা ক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে কর্মরত প্রতিষ্ঠান— ধ্যান ফাউন্ডেশন, চাকুলিয়া এবং ওড়িশার কেন্দুঝরের পরিবেশ তথা বনভূমি সংরক্ষণে সক্রিয় পরিবেশ আন্দোলনকর্মী শ্রী রমেশ চন্দ্র মিশ্রকে এই বছরের ‘রাম-শরদ কোঠারী প্রতিভা সম্মান’ প্রদান করা হয়।



ভারতমাতা ও বীরগতিপ্রাপ্ত করসেবকদ্বয় রাম-শরদ কোঠারীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। সভামঞ্চে অতিথিরা আসন গ্রহণের পর তাঁদের পরিচয়পর্ব ও বরণের পর ‘রাম-শরদ কোঠারী স্মৃতি সঙ্ঘ, কলকাতা’-র সম্পাদক রজত চতুর্বেদী এই সংস্থার পরিচয় সকলের সামনে তুলে ধরেন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি শ্রী রাজেশ আগরওয়াল এবং এদিনের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি— বিশিষ্ট উদ্যোগপতি শ্রী অংশুল চমড়িয়া ও শ্রী সৌরভ দুগড়।

অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী। এরাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে কোঠারী ভ্রাতৃদ্বয়ের স্মরণে সম্মাননা প্রদানের বিষয়টি-সহ তাঁদের স্মরণে কলকাতায় রাস্তার নামকরণের প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিবেচনা করবে বলে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও এরাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে রাম-শরদ কোঠারীর স্মরণে সম্মাননা প্রদানের বিষয়টি-সহ সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সঞ্জয় মণ্ডল। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন পঙ্কজ চৌধরী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের উদ্দেশে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন রাম-শরদ কোঠারীর বোন পূর্ণিমা কোঠারী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামলালজী, সুনীলপদ গোস্বামী, রমাপদ পাল, জলধর মাহাত, অজয় নন্দী, বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়, রাজেশ কুমার আগরওয়াল, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার, জোড়াসাঁকোর বিধায়ক বিজয় ওঝা, পূর্বতন পুরমাতা শ্রীমতী মীনাদেবী পুরোহিত-সহ কিশন ঝাওয়ার, ব্রহ্মানন্দ বংগ প্রমুখ বিশিষ্টজন। কার্যক্রমটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলেন ‘রাম-শরদ কোঠারী স্মৃতি সঙ্ঘ, কলকাতা’র কার্যকর্তা— প্রদীপ আগরওয়াল, বিশাল বগলা, অশোক জয়সওয়াল, অনীতা বুবনা, আনন্দ জয়সওয়াল, বীরেন্দ্র মোদী, পঙ্কজ চৌধরী, রোহিত শর্মা, অভিষেক বজাজ, প্রভাত জৈন, হিমাংশু রস্তোগী, শচীন গুপ্তা, যশস্বিনী মহেশ্বরী, রাজীব শরণ প্রমুখ।

জেবি রায় কলেজে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের নতুন ইউনিট

ছাত্রস্বার্থে গঠনমূলক কাজের অঙ্গীকার

কলকাতার জেবি রায় স্টেট আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রাজ্য ও জেলা নেতৃত্বের উপস্থিতিতে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কলেজ ইউনিটের নতুন কমিটি গঠনের বিষয়ে সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। দীর্ঘদিন ধরে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা, শিক্ষার পরিবেশ, পরিকাঠামো ও ছাত্রস্বার্থের বিষয়গুলি নিয়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নতুন দায়িত্বপ্রাপ্তরা আগামীদিনে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে থেকে আরও সংগঠিত ও গঠনমূলকভাবে কাজ করার অঙ্গীকার করেন।



পরিষদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের প্রভাবের কারণে দীর্ঘদিন জেবি রায় কলেজের মতো ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার স্বাভাবিক পরিবেশ বিভিন্ন সময়ে ব্যাহত হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য— ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার পরিবেশকে অগ্রাধিকার দিয়ে কলেজে শান্তিপূর্ণ ও সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ উত্তর কলকাতা জেলা কনভেনর বিশাল নন্দী বলেন— 'জেবি রায়ের মতো ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার পরিবেশ ও ভবিষ্যৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগামীদিনে ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবিদাওয়ার বিষয়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ ধারাবাহিকভাবে কাজ করবে। কলেজে একটি শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক ও শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলাই আমাদের অন্যতম লক্ষ্য।' নতুন ইউনিটের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে--- আয়ুর্বেদ শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান জেবি রায় কলেজ। এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থ ও শিক্ষার পরিবেশের বিষয়ে বিদ্যার্থী পরিষদ বরাবরই সক্রিয়। আগামীদিনে রাজ্য নেতৃত্বের দিশায় জেবি রায় কলেজ ইউনিট আরও শক্তিশালীভাবে ছাত্রস্বার্থে কাজ করবে এবং গঠনমূলক কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। রাজনৈতিক বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার অধিকার, কলেজের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশ এবং ভবিষ্যৎ আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের স্বার্থে ধারাবাহিকভাবে কাজ করা হবে।



জগৎ ধারিণী জগদ্ধাত্রী

নন্দলাল ভট্টাচার্য

সেই আদ্যাশক্তিই

পরা প্রকৃতি আদ্যাশক্তি। ব্রহ্মস্বরূপা তিনি ত্রিগুণাত্মিক। এক হয়েও তিনি আপন লীলায়— নিজের ইচ্ছায় অথবা যুগ বা কালের প্রয়োজনে অবতীর্ণ হন নানা রূপে। সেইসব রূপের মধ্যেই প্রতিভাত হয় তাঁর ঐশ্বর্য— তাঁর মহিমা— তাঁর স্বরূপ।

সেই রূপ রূপান্তরের খেলা, যার অন্য নাম লীলা— সেই আদ্যাশক্তি আশ্বিনে শেষ-শরত থেকে কার্তিকে হেমন্তের সূচনা পর্যন্ত তিন পক্ষকালে আবির্ভূতা হন তিন রূপে। আশ্বিনের শুক্লপক্ষে তিনি দেবী দুর্গা— অসুর বিনাশিনী— দস্যুদলনী, কার্তিকের কৃষ্ণপক্ষে তিনি কালী- কপালিনী-রণরঙ্গিনী আর কার্তিকেরই শুক্লপক্ষে তিনি জগৎপালিকা— জগদ্ধাত্রী— শান্তি স্বরূপিনী। চতুর্ভুজা তিনি স্মিতাননা— সত্ত্বগুণে সুহাসিনী।

অধ্যাত্ম-ঐতিহ্যে শরতে যিনি শারদীয়া দুর্গা, কার্তিকের অমানিশায় তিনি সেই দেবী দুর্গা বা কৌশিকীর দেহ সম্ভূতা করালবদনা কালী, আবার সেই একই শক্তি হেমন্তের শুক্লপক্ষে হৈমবতী-উমা-জগদ্ধাত্রী রূপে পূজিতা।

একই দেবী— বিভিন্ন তাঁর নাম। ত্রিগুণের আধার দেবী শক্তি শরতে রাজসিক গুণবতী দুর্গা। কার্তিকে হেমন্তের কৃষ্ণপক্ষে তিনি তামসিক গুণান্বিতা কালী এবং শুক্লপক্ষে তিনিই আবার সাত্ত্বিকরূপে জগদ্ধাত্রী হিসেবে পূজিতা। শাস্ত্রীয় বচন সাত্ত্বিক জগদ্ধাত্রী ব্রাহ্মণের, রাজসিক দুর্গা ক্ষত্রিয়ের এবং তামসিক কালী বাকি আর সকলের অর্চিতা। যদিও সেই বিধানের বেড়া ভেঙে দুর্গা-কালী-জগদ্ধাত্রী আজ সকলেরই আরাধ্যা— গৃহমন্দির থেকে সর্বজনীন পূজা মণ্ডপে।

সনাতন দর্শন ও ঐতিহ্যে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। তিনিই সব কিছুর উৎস। তিনিই পুরুষ আবার প্রকৃতিও তিনিই। শিবপুরাণের কথা, ব্রহ্ম হলেন শিব। তাঁরই বাঁ-দিক থেকে আবির্ভাব ঘটে আদি পরাশক্তির।

লিঙ্গ পুরাণের মতে শিব ও পার্বতীই হলেন পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতি। তাঁদের মিলনের মধ্য দিয়েই শুরু জীবনের বিবর্তন।

একথা সত্য, বৈদিক দর্শনের বিশ্লেষণ আর পৌরাণিক বর্ণনার মধ্যে রয়েছে কিছু কিছু বৈসাদৃশ্য। সেটা হয়তো স্বাভাবিকও। তবে পৌরাণিক কাহিনিরও শিকড় রয়ে গিয়েছে বৈদিক দর্শনেরই গভীরে। সে কারণেই বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও এই দুয়ের মধ্যেও আছে এক ধরনের সাদৃশ্য। তারই মধ্য দিয়ে ধ্বনিত ঐক্য ও সংহতির বিভিন্ন বার্তাও।

দেবী গীতার বর্ণনায়, মহাদেবী বা আদিশক্তিই অবতীর্ণ হন পার্বতীরূপে।

তার আগে তিনি যান নগরাজ হিমালয়ের কাছে। তাঁকে দেখান তাঁর প্রায় অপ্রকাশিত রূপ। শোনান চিরন্তন জ্ঞান ও ঐশ্বরিক কথা। বলেন, তিনিই সব। তাঁর আদি নেই— অন্তও নেই। তিনিই একমাত্র সত্য। এই মহাবিশ্ব তাঁরই সৃষ্টি। তিনিই বিজয়ী এবং বিজয়েরও প্রকাশ।

সেদিন তিনি যে রূপ দেখান হিমালয়কে— তা দেখে স্তব্ধ নগাধিপতি। তিনি দেখেন অপূর্ব জ্যোতির্ময়ী এক দেবীকে— যাঁর কপালে বিদ্যমান সত্যলোক; ঘন কেশরাজি তাঁরই সৃষ্ট এই মহাবিশ্ব। সূর্য-চন্দ্র তাঁর দুটি চোখ, বেদ তাঁর শব্দ, মায়া তাঁর হাসি, তাঁর দন্ত পঙ্‌ক্তি হলো মৃত্যু স্নেহ ও আবেগ।

কুষ্মাণ্ডরূপী এই দেবীই জগৎ প্রসবিনী। তিনিই স্রষ্টা— তিনিই ধাত্রী এবং তিনিই এর বিনাশিনী। তিনিই সেই শূন্য যা ছিল সৃষ্টির আগে ও পরেও। তিনিই জগৎ-পালনী দেবী জগদ্ধাত্রী।

কার্তিকে তাঁর আবির্ভাব

ত্রিনয়নী তিনি দেবী জগদ্ধাত্রী। চতুর্ভুজা— নানা প্রণয়-ধারিণী। সিংহের উপরে আসীন দেবীর গায়ের রং নবারুণের মতোই উজ্জ্বল। নানা আভরণে ভূষিতা দেবীর উপবীত একটি সাপ। জ্যোতির্ময়ী দেবী নানা আয়ুধ নিয়েও অপরূপা— শান্তি স্বরূপা। তাঁর ত্রিনয়নে নেই ক্রোধের সামান্যতম আভাস। স্মিতানয়না দেবীর প্রতি তাকালেই মন হয় শান্ত। হয় সমাধিস্থ।

দেবী জগদ্ধাত্রী। আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁর ত্রেতার প্রথম দিনটিতে। —কার্তিকে শুক্লপক্ষেজুহ্নি ভৌমবারে জগৎ প্রসূঃ। সর্বদেবহিতার্থায় দুর্বৃত্তশমনায়চ।। —কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের মঙ্গলবারে দেবতাদের হিতসাধন ও মঙ্গলের জন্য জগতের ধাত্রী বা জন্মদাত্রী হিসেবে দেবী মহামায়ার এই বিশেষ রূপে আবির্ভাব ঘটে। একথা রয়েছে দুর্গাকল্পে।

দুর্গাকল্পের ওই বক্তব্য থেকে জানা যায়, কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের এক মঙ্গলবারে দেবী জগদ্ধাত্রীর আবির্ভাব। কিন্তু তিথিটা কবে? শুক্লপক্ষে কম করে তো দুটা মঙ্গলবার পড়েই— তার কোনটাতে হবে দেবীর আরাধনা?

এই জিজ্ঞাসার বা সংশয় ঘুচিয়ে দিয়ে কুব্জিকা তন্ত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'কার্তিকে শুক্লপক্ষে তু নবম্যাং জগদম্বিকাম্।/দুর্গাং প্রপূজয়েদ্ভক্ত্যা ধর্মকামার্থ সিদ্ধয়ে'— কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে জগতের মঙ্গল এবং ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ লাভের জন্য জগদম্বা দুর্গার অর্চনা করা উচিত।

কুব্জিকা তন্ত্রের এই নির্দেশ থেকে জানা যায় কার্তিকমাসের কোনো সময়ে দেবী জগদ্ধাত্রীর পূজা হবে তার সুনির্দিষ্ট তিথি ও সময়ের কথা। একইসঙ্গে একথাও সত্য, দেবী দুর্গারই একটি রূপ হলো জগতের মা জগদ্ধাত্রী। অর্থাৎ দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী অভিন্ন। একই মুদ্রার দুই পিঠ।

দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী

যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন। এই শব্দবন্ধের অর্থ যাইহোক, বাস্তবে বাহান্ন ও তিপ্পান্ন কখনই এক নয়। একই উৎস থেকে উদ্ভূত হলেও দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী সর্বার্থে কখনই এক নন। উৎস একই পরাশক্তি হলেও তাঁদের মধ্যে পার্থক্য কিছু রয়েই গেছে।

দেবী দুর্গার আবির্ভাব হয়েছিল মহিষাসুরের অত্যাচার থেকে দেবতাদের রক্ষা করার জন্য। ত্রিদেব ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-সহ সমস্ত দেবতার তেজ সম্ভূতা দেবী দুর্গার হাতের অস্ত্রও দেন দেবতারাই। আর সেইভাবেই দশভুজা দুর্গার মহিষাসুরকে বধ করে স্বর্গ ও মর্ত্যে শান্তি ফিরিয়ে আনেন।

অন্যদিকে দেবতাদের অহংকার চূর্ণ করে তাঁদের প্রকৃত সত্যটি জানাবার জন্য আবির্ভাব হয় জ্যোতির্ময়ী জগদ্ধাত্রীর। এক্ষেত্রে কোনো অসুর বধের জন্য পরাশক্তির এই প্রকাশ ঘটেনি।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় দুর্গা দশভুজা, জগদ্ধাত্রী চতুর্ভুজা। দুর্গার পদতলে রয়েছে মহিষের দেহ থেকে নির্গত মহিষাসুর। অন্যদিকে জগদ্ধাত্রীর পায়ের তলায় কোনো মানবরূপী অসুর নয়, বরং রয়েছে একটি হাতি। অবশ্য এই হাতিকে বলা হয় করীন্দ্রাসুর। দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী দুজনেরই বাহন সিংহ। তবে দুর্গার ক্ষেত্রে সিংহ আক্রমণমুখী, অন্যদিকে জগদ্ধাত্রীর বাহন সিংহ শান্তভাবে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকে হাতির মাথায়। দুর্গা থাকেন সপরিবারে; জগদ্ধাত্রী তখন প্রায় একক, পাশে থাকেন দুই সখী জয়া ও বিজয়া।

দুর্গা হলেন রজোগুণের আধার। উদ্যম, যুদ্ধ ও সংহারের মূর্তি দুর্গা। জগদ্ধাত্রী সেখানে সত্ত্বগুণের প্রতীক। শান্ত, ধীর এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালনের মাতৃমূর্তি তিনি।

দেবী দুর্গার আবির্ভাব হয়েছিল দেবতা ও মরজগৎকে অসুরের বা অশুভশক্তির অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা করার জন্য। অন্যদিকে পরাশক্তি জগদ্ধাত্রীর রূপ নেন দেবতা এবং সমস্ত জীবজগৎকে শিক্ষা দেবার জন্য সকলকে নিজপথে সুস্থিত করার জন্য। এই মৌল পার্থক্য নিয়েই দুই দেবী পূজিতা হন এই মর্ত্যধামে।

অহঙ্কারেই পতন

অহংকার যেন আত্মার আত্মীয়। একবারে সহজাত। সে দেবতা হোক অথবা মানুষ, সকলেই কোনো না কোনো ভাবে অহংকারের দাস। আত্মস্থ হতে না পারলে অথবা সংযমকে সঙ্গী করতে না পারলে, অহঙ্কারই ত্বরান্বিত করে পতনকে। ডেকে আনে অস্তিত্বের সামনে নানা সংকট। আর সে কারণেই ভক্ত কবির মায়ের কাছে আর্তি— আমার অহঙ্কারের মূল কেটে দে।'

একদিন থেকে এই অহঙ্কার যেন কাঁঠালের আঠা। এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার বড়ো সহজ নয়। তাই-বা কেন, অহংকারই ডেকে আনে চরম সংকট। ভারতীয় দর্শনে, তাই অহংকার সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে নানাভাবে। অহংকারের বিপদ থেকে রেহাই নেই

দেবতাদেরও। অহংকারে মত্তদের নিজ ভাবে স্থিত করার জন্যই তাই অবতীর্ণ হতে হয় মহামায়াকে। দেবী জগদ্ধাত্রীর আবির্ভাব সম্পর্কেও জানা যায় একই রকম তথ্য।

দেবী জগদ্ধাত্রীর আবির্ভাব কাহিনির বীজটা রয়ে গিয়েছে কেন উপনিষদের তৃতীয় বিভাগের একটি কাহিনিতে। সেই কাহিনির সারসংক্ষেপ হলো— একবার অসুরদের বিরুদ্ধে জয়লাভের পর দেবতারা হারিয়েছেন এই অহংকারে তাঁরা ভুলে গেলেন সব কিছু। দেবতাদের ওই অহংকার দেখে মনে মনে হাসেন ব্রহ্মা। দেবতাদের ওই অহংকার চূর্ণ করার জন্য তিনি এক জ্যোতির্ময় যক্ষের রূপ নিয়ে আবির্ভূত হলেন তাঁদের সামনে। তাঁকে দেখে তাঁর স্বরূপ জানার জন্য দেবতারা পাঠালেন অগ্নিকে।

যক্ষের প্রশ্নের উত্তরে অহংকারী অগ্নি বলেন, আমি সব কিছু দগ্ধ করতে পারি আমার তেজে। যক্ষ তখন একটি তৃণখণ্ড রেখে বলেন, পোড়াও এটি। অগ্নি তাঁর সব শক্তি দিয়েও পোড়াতে পারেন না ওই সামান্য একগাছি তৃণকে। ব্যর্থ অগ্নি মাথা নীচু করে ফিরে আসেন।

শেষে দেবরাজ ইন্দ্র গেলেন। কিন্তু তিনি যাওয়ামাত্র অন্তর্হিত হন যক্ষ। ঘটনার এই আকস্মিকতায় বিস্মিত ইন্দ্র। বুঝতে পারেন না কিছুই। সেইসময় ইন্দ্রের সামনে আবির্ভূত হন দিব্যজ্যোতির্ময়ী দেবী উমা হৈমবতী।

হতভম্ব ইন্দ্র জানতে চান দেবীর পরিচয়। উত্তরে দেবী উমা হৈমবতী বলেন, এই যক্ষ আর কেউ নন, তিনিই পরব্রহ্ম। দেবতারা নিজেদের পরাক্রম মনে করে বিজয় নিয়ে যে গর্ব করছেন, সেটা প্রকৃতপক্ষে তাঁদের জয় নয়। এই জয় তাঁরা নিজেদের শক্তিতে অর্জন করতে পারেননি। ওই জয় বা শক্তি একমাত্র ব্রহ্মেরই জয়। তাঁর কৃপা বা ইচ্ছা না হলে সামান্য একগাছি তৃণকে দহন বা উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া এমন কি একটুখানি সরানোর ক্ষমতাও তাঁদের নেই।

> **বাংলা সাহিত্যের বহু লেখকই তাঁদের গ্রন্থে জগদ্ধাত্রীর কথা বলেছেন। তাঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে জগদ্ধাত্রীর যে রূপ এঁকেছেন শব্দের আখরে— তা আজও ভক্তি নম্র করে মানুষকে। আজও মুগ্ধ করে সকলকে।**

অহংকারের বাঁধ ভাঙে ইন্দ্রের। জানতে চান তিনি ব্রহ্মের কথা। দেবী তখন তাঁকে দেন ব্রহ্মবিদ্যা বা পরম সত্যর দীক্ষা।

কেন উপনিষদের এই দেবী হৈমবতী উমা হলেন ব্রহ্মবিদ্যা বা চেতনার রূপ।

কেন উপনিষদের এই কাহিনিই একটু ভিন্নভাবে বলা হয়েছে কাত্যায়নী তন্ত্রে। অসুর বধের পর দেবতারা অহংকারে মদমত্ত হয়ে উঠলে দেবী মহামান্য-মহাশক্তি তাঁদের সামনে আবির্ভূত হন। তাঁর নির্দেশ মতো এক গাছি ঘাসকে পোড়াতে, সরাতে ব্যর্থ দেবতাদের বলেন তিনি, কীসের গর্ব করছো তোমরা? কতটুকু ক্ষমতা তোমাদের? দেখলে তো, একগাছি তৃণকে দগ্ধ করার, সরানোর বা ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতাটুকুও নেই তোমাদের। তোমরা করছো বলে যে অহংকারে স্ফীত হচ্ছ তোমরা— তা করছি আমিই!

দেবীর কথায় ভুল ভাঙে দেবতাদের। বুঝতে পারেন তাঁরা প্রকৃত তত্ত্ব এবং তাঁর পরেই শুরু করেন তাঁরা দেবীর বন্দনা। দেবী তখন জগদ্ধাত্রী রূপে তাঁর বাহন সিংহের ওপরে বসলেন। আর সেই সময় দেবী দেবতাদের যে মদমত্ত অহংকারী মনকে বশ করেন, তা হাতির রূপ নিয়ে স্থান পায় দেবীর পায়ের নীচে। তাই-বা কেন, অহংকার রূপী সেই হাতির মাথার উপরে থাবা মেরে বসে দেবীর বাহন সিংহ এবং দেবীও হন সিংহবাহিনী।

দেবীর এই সিংহবাহিনী মূর্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করে তাই বলা হয়, 'আমাদের মন মত্ত হস্তীর ন্যায় সর্বদা মদান্বিত। সে অস্থির। উন্মাদ। এই দুরন্ত মন-করীকে সদা উদ্যমশীল বিবেক সিংহের দ্বারা মর্দন করতে হবে। মন বশীভূত হলেই অন্তরে চৈতন্যরূপী জগদ্ধাত্রীর মহাপ্রকাশ অনায়াস লভ্য হবে।' (স্বামী নির্মলানন্দ : দেব-দেবী ও তাঁদের বাহন)।

এই একই কথা শ্রীম-কে শুনিয়েছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও। বলেছিলেন, 'জগদ্ধাত্রী রূপের মানে কী জান? যিনি জগৎকে ধারণ করে আছেন। তিনি না ধরলে জগৎ পড়ে যায়— নষ্ট হয়ে যায়। মনকরীকে যে বশ করতে পারে তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হয়।'

বিভিন্ন পুরাণ মতে, জগদ্ধাত্রী হলেন সিদ্ধিধাত্রীর রূপভেদ। ভুবনেশ্বরী ও দুর্গার যৌথরূপ হলেন জগদ্ধাত্রী, এমন কথা বলা হয়েছে কোনো কোনো পুরাণে। শিব পুরাণ এবং কিছু তন্ত্রগ্রন্থে জগদ্ধাত্রীকে উমা হৈমবতী নামে অভিহিত করা হয়েছে। কাত্যায়নী তন্ত্রে তাঁকে বলা হয়েছে মহাদুর্গা।

এক তবু ভিন্ন

দুর্গা ও জগদ্ধাত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের কথা স্পষ্ট ভাবে লেখা আছে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীতে। মহিষাসুরকে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত ও নিহত করার জন্য সমস্ত দেবতার তেজ ও শক্তি সম্ভূতা দেবী দুর্গা দশহাতে দশ অস্ত্র নিয়ে নামলেন সংগ্রামে। অসুর মহিষ

সেসময় নানা মায়া বিস্তার করে দেবীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। নেয় নানা রূপ। দেবীও অসুরের যেইসব মায়া মূর্তিকে নিহত করতে থাকেন একেক ভাবে।

সংগ্রামের এমনই এক মুহূর্তে অসুর রূপ নেয় এক বিশাল মত্ত হস্তীর। সেই অসুরের নাম করীন্দ্রাসুর। দুর্গা সেসময় সেই করীন্দ্র বা গজরাজকে হত্যার জন্য রূপ নেন চতুর্ভুজা দেবীর। এই চতুর্ভুজা দেবী তাঁর হাতের চক্র দিয়ে ছিন্ন করেন সেই মত্ত হস্তী বা করীর প্রকাণ্ড শুঁড়টি। দেবীর এই চতুর্ভুজা রূপটিই জগদ্ধাত্রী বা করীন্দ্রসুরনিসূদিনী নামে খ্যাত।

তন্ত্রগ্রন্থে দেবী জগদ্ধাত্রীর আবির্ভাব সম্পর্কে রয়েছে ভিন্ন একটি কাহিনি রয়েছে একসময় অহংকার, লোভ ও অজ্ঞতার প্রতীক তিন অসুর বা ত্রিপুরাসুর ত্রাস সৃষ্টি করে স্বর্গ-মর্ত্য-সহ ত্রিলোকেই। ত্রিপুরাসুরের শক্তির কাছে অসহায় দেবতারা শরণ নেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু- মহেশ্বর। ত্রিপুর বধের জন্য ত্রিদেব একইসঙ্গে প্রার্থনা জানান আদিশক্তি মহামায়ার কাছে। তখনই ত্রিলোক ভরে উঠল দ্যুতিময় এক আলোকধারায়। সেই আলোর সাগর থেকেই উঠে এলেন দেবী জগদ্ধাত্রী— সিংহবাহিনী। সকলের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে তিনি রুদ্ধ করলেন ত্রিপুরাসুরের অহংকার, লোভ ও অজ্ঞতার অন্ধকার। জগতে ফিরে এলো আলো, বিশ্বাস ও শক্তির জ্যোতি। সে দিন থেকেই দেবী পরিচিত হলেন দেবী জগদ্ধাত্রী রূপে।

জগতের ধাত্রী বা রক্ষাকারিণী এই দেবীর বাহন সিংহ হলো অদম্য সাহস ও শক্তির প্রতীক। তাঁর চার হাতের শঙ্খ, চক্র, ধনুর্বাণ হলো যথাক্রমে আদিধ্বনি— যার থেকে উদ্ভব হয় সৃষ্টির, ধারণ শক্তি এবং মন ও একাগ্রতার প্রতীক। আর ভোরের সূর্যের স্বর্ণদ্যুতিময় দেবীর গায়ের রং হলো আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উষা এবং তাঁর সর্প উপবীতটি হলো ভয় ও মৃত্যুর উপর দেবীর আধিপত্যের প্রতীক।

বঙ্গে জগদ্ধাত্রী পূজা

বঙ্গদেশে দুর্গাপূজা প্রচলনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণের নাম। একইভাবে জগদ্ধাত্রী পূজার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নাম। প্রচলিত কাহিনি, ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে দুর্গাপূজার সময় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কোনো কারণে বন্দি ছিলেন তৎকালীন নবাবের কারাগারে। সে কারণে করতে পারেননি দুর্গা-আরাধনা। মুক্তি পেয়ে এক স্বপ্নাদেশের ভিত্তিতে পরের মাসে অর্থাৎ কার্তিক মাসের নবমী তিথিতে শুরু করেন জগদ্ধাত্রী পূজা। সময় কাল নিয়ে কিছু মতভেদ থাকলেও বঙ্গদেশে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন যে কৃষ্ণনগরে একথা মেনে নিয়েছেন প্রায় সকলেই। কৃষ্ণনগরের পর এই পূজা শুরু হয় চন্দননগরে।

মনে করা হয় যে, শান্তিপুর থেকে দশ কিলোমিটার দূরের হরিপুর ব্রহ্মশাসন অঞ্চলের সাধক চন্দ্রচূড় তর্কচূড়ামণি প্রথম দেবী প্রতিমার রূপ, মূর্তি-বিবরণ, পূজা পদ্ধতি, ধ্যান, পূজার কাল ইত্যাদির নির্দেশ দেন। অবশ্য অন্য মতে পঞ্চদশ শতকের বিখ্যাত শাক্ত কৃষ্ণানন্দ আগামবাগীশের উত্তরপুরুষ সিদ্ধসাধক তন্ত্রজ্ঞ রঘুনাথ তর্কবাগীশষ ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ১৬০টি তন্দ্র এবং শতাধিক বৈদিক গ্রন্থ ও পুরাণ মন্থন করে 'আগমতত্ত্ব বিলাস' নামে যে রীতিনীতি লিপিবদ্ধ হয়। সেই গ্রন্থ অনুসারেই এখনো হয় জগদ্ধাত্রী অর্চনা।

মা সারদামণির পূজা

জগদ্ধাত্রী পূজার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শ্রীমা সারদা দেবীর নামও। জয়রামবাটিতে সারদামণির মা শ্যামাসুন্দরী দেবী ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে (১২৮৫ সালে) প্রথম এই পূজা শুরু করেন। এর পেছনে রয়েছে একটি ঘটনা। শ্যামাসুন্দরী দেবী প্রতি বছর গ্রামেরই নব মুখুজ্জের বাড়ির কালী পূজার জন্য চাল দিতেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে কোনো এক বিবাদের কারণে নব মুখুজ্জে ওই চাল নিতে অস্বীকার করেন। মায়ের পূজায় চাল দিতে না পেরে শ্যামাসুন্দরী দেবী মর্মাহত। নিদারুণ যন্ত্রণায় বিদ্ধ তাঁর হৃদয়। সেই রাতেই স্বপ্নে দেখা দেন জগদ্ধাত্রী দেবী। বলেন তাঁর পূজা করতে। কালীপূজার জন্য সেই চাল দিয়েই সেবছর দেবী জগদ্ধাত্রীর পূজা করলেন শ্যামাসুন্দরী দেবী। সেবার ভাসানের দিন পড়ে বৃহস্পতিবারে। তাই ওই দিনে বিসর্জন দিতে নিষেধ করেন সারদা দেবী। পরের দিন সংক্রান্তি। তারপর পয়লা। সারদা দেবী ওই দুদিনও বিসর্জন দিতে নিষেধ করেন। তাই বিসর্জন হয় চতুর্থ দিন রবিবারে।

পরের বছর পূজা না করার কথা বলেন সারদা দেবী। কিন্তু আবার স্বপ্নাদেশ। তাই পূজা বন্ধ হয় না। এরপর পূজা বন্ধের কথা উঠলেই স্বপ্নে দেখা দেন দেবী জগদ্ধাত্রী। ফলে পূজা চলতেই থাকে। তাই মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সারদা দেবী জয়রামবাটিতে এসে জগদ্ধাত্রী পূজা করতেন। পূজা যাতে পরবর্তীকালেও বন্ধ না হয়ে যায় তার জন্য সাড়ে দশবিঘার কিছু বেশি জমি তিনি দেবোত্তর করে দেন। এখনও আগের ধারাতেই জয়রামবাটিতে হয় জগদ্ধাত্রী পূজা।

জয়রামবাটির মতো বেলুড় রামকৃষ্ণ সারদা মিশনেও হয় জগদ্ধাত্রী পূজা সাড়ম্বরেই।

বঙ্কিম মননে

বাংলা সাহিত্যের বহু লেখকই তাঁদের গ্রন্থে জগদ্ধাত্রীর কথা বলেছেন। তাঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে জগদ্ধাত্রীর যে রূপ এঁকেছেন শব্দের আখরে— তা আজও ভক্তি নম্র করে মানুষকে। আজও মুগ্ধ করে সকলকে। প্রসঙ্গত, এই 'আনন্দমঠ' উপন্যাসেই রয়েছে জাতীয় গান বন্দে মাতরম্— যা কেবল দেশজননী নয়, দেবী জগদ্ধাত্রীরও বন্দনাগীত। □



শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী কথা

গোপাল চক্রবর্তী

ধ্যানমন্ত্রানুসারে দেবী জগদ্ধাত্রী সিংহস্কন্ধে আসীনা, নানা অলংকারে ভূষিতা, চর্তুভূজা, দেবীর বসন গাঢ় রক্তিমবর্ণ। দেবীর গাত্রবর্ণ উদীয়মান সূর্যের মতো। দেবীর যজ্ঞোপবীত কালসর্প। চতুর্ভূজা দেবীর বামহস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও ধনুক। দক্ষিণহস্তদ্বয়ে চক্র ও পঞ্চবাণ। কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত রূপে ধ্যানটি 'তন্ত্রসারে' পাওয়া যায়।

দুর্গার রূপভেদ 'জগদ্ধাত্রী'। মায়াতন্ত্রে (দ্বিতীয় ও চতুর্থপটল) ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের 'তন্ত্রসার' গ্রন্থে দুর্গা প্রসঙ্গে দেবী জগদ্ধাত্রীর কথা উত্থাপিত হয়েছে। কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে জগদ্ধাত্রী পূজার বিশেষ বিধান পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর বৃহস্পতি রায় মুকুটের 'স্মৃতি রত্নহার' ও শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণির 'কৃত্যতত্ত্বার্ণব' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।

মহিষাসুর বধের সময় দেবীকে বিভ্রান্ত করার জন্য মহিষাসুর বারবার রূপ পাল্টাতে থাকে। এক সময়ে সে প্রচণ্ডমত্ত হস্তীর রূপ ধারণ করে দেবীকে আক্রমণ করে। দেবী দুর্গা তখন চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী মূর্তি ধারণ করে চক্রদ্বারা সেই করীন্দ্রাসুরের মস্তক ছেদন করলে মহিষাসুর পুনরায় মহিষ রূপ ধারণ করে। হস্তী বা করীরূপ মহিষাসুর নিগ্রহের সেই চতুর্ভুজা চতুর্প্রহরণধারিণী রূপের বর্ণনা 'মায়াতন্ত্র' ও কৃষ্ণনন্দ আগমবাগীশের 'তন্ত্রসার' গ্রন্থে পাওয়া যায়।

পুরাণ মতে সমবেত দেবতার মিলিত তেজপুঞ্জে সৃষ্টি হলেন দেবী দুর্গা। দেবতাদের প্রদত্ত অস্ত্রসমূহের দ্বারা তিনি বধ করলেন দুরাত্মা মহিষাসুরকে। দেবতারা বিপদমুক্ত হয়ে ভাবলেন, এই দেবী আমাদের তেজেই সৃষ্ট, আমাদের শক্তিতেই শক্তিমতী, আমাদের প্রদত্ত অস্ত্রেই মহিষাসুরকে বধ করেছেন। এঁর নিজস্ব কোনো শক্তি নেই, অস্তিত্বও নেই। প্রধান দেবতা ইন্দ্র, অগ্নি, পবন আর বরুণ। তাঁরা নিজেদের সর্বশক্তিমান ভাবতে শুরু করলেন। দেবী দুর্গা তখন এক বালিকার রূপ ধরে তাঁদের অহঙ্কার ভঙ্গের জন্য তাঁদের কাছে এলেন। একটি তৃণখণ্ড ভূমিতে রেখে সেটি যে কোনো একজনকে ধ্বংস করতে বললেন। সর্বপ্রথম ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করলেন। বজ্র ব্যর্থ হলো। সেই তৃণখণ্ডকে নাড়তেও পারলেন না। অগ্নি সমগ্র শক্তি দিয়েও সেই তৃণখণ্ডকে দহন করতে পারলেন না। বায়ু প্রচণ্ড প্রবাহে তাকে স্থানান্তরিত করতে পারলেন না। বরুণ প্রচণ্ড বারিপাতেও তৃণখণ্ডকে ভেজাতে পারলেন না। দেবগণ তখন সেই বালিকার কাছে নতমস্তক হলেন। আর সেই বালিকা তখন রক্তাম্বর, সালাঙ্কারা, চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী মূর্তিতে আবির্ভূতা হয়ে দেবতাদের বুঝিয়ে দিলেন যে তিনিই সর্বশক্তির আধার, জগতের ধারণকর্ত্রী, জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী।

উপনিষদে ইনি উমা হৈমবতী। রাজসিক দেবী দুর্গা, তামসিক দেবী কালীর পর সত্ত্বগুণ সম্পন্না দেবী জগদ্ধাত্রী।

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী দেবীর পূজার প্রচলন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। সময় অষ্টাদশ শতক, বঙ্গদেশে তখন ইসলামি শাসন। বঙ্গের মসনদে তখন নবাব আলিবর্দি খান। কৌশলে প্রভু সরফরাজ খানকে পরাজিত ও নিহত করে সেনাপতি আলিবর্দি বঙ্গের মসনদে আসীন। ভাস্কর পণ্ডিতের দুর্ধর্ষ মারাঠা সেনারা ইসলামি শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে। রাজকোষ শূন্য, সেনারা বিক্ষুব্ধ। এই অবস্থায় আলিবর্দি বাংলার জমিদারদের উপর বাড়তি করের বোঝা চাপালেন। কর পরিশোধ না করলে কঠিন ব্যবস্থা। এক বিশাল পরিমাণ করের ফরমান এল নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে। দাবি বারো লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। কৃষ্ণবাবের রাজকোষে এত স্বর্ণমুদ্রা নেই। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে খাজনা দিতে না পারায় নবাবি ফৌজ বন্দি করল মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে। আশ্বিন মাস দুর্গাপূজা সমাগত, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বন্দি নবাবের কারাগারে। রাজবাটীর দুর্গা মণ্ডপে সেবছর আর আলো জ্বলল না।

রানি তাঁর সমস্ত অলঙ্কার, রত্ন জগৎশেঠের কাছে বন্ধক রেখে অর্থ সংগ্রহ করে খাজনা পাঠালেন মুর্শিদাবাদে। বারো লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা হাতে পেয়ে আলিবর্দি কৃষ্ণচন্দ্রকে কারাগার থেকে মুক্তি দেবার আদেশ দিলেন। মুক্ত হয়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বজরায় ফিরছেন কৃষ্ণনগরে। শরৎ ঋতু, আশ্বিন মাস, দুর্গাপূজার সময়। এবছর বন্দি দশার জন্য মায়ের পূজার আয়োজন হয়নি, রাজার মন তাই ভারাক্রান্ত। দৈবক্রমে সেইদিন ছিল বিজয়াদশমী। মায়ের বিসর্জন চলছে গঙ্গার তীরে তীরে। আকুল হয়ে উঠল রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মন। কান্নায় ভেঙে পড়লেন রাজা। সেই দেবী চতুর্ভুজা রূপে তাঁকে দর্শন দিয়ে আদেশ করলেন— আগামী শুক্লা নবমীতে একদিনে তিনবার মায়ের পূজা করলে তিনি দুর্গাপূজার ফল প্রাপ্ত হবেন। কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে মহা সমারোহে হলো কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে মায়ের পূজা। জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন সম্পর্কে আর একটি মত হলো কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে এই পূজার প্রচলন করেন কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র গিরিশচন্দ্র। সেখানেও জগদ্ধাত্রী পূজা তিথি মেনে শুধুমাত্র নবমী তিথিতে সম্পন্ন হয়েছিল।

মা জগদ্ধাত্রীর আর একটি লীলা জয়রামবাটীতে সারদামায়ের পিতৃগৃহে প্রকটিত হয়েছিল। সাল আনুমানিক ১৮৭৫। গ্রামের কালী পূজায় গ্রাম্য কোন্দলের আবহে শ্রীরামকৃষ্ণের শাশুড়িমাতা শ্যামাসুন্দরী দেবীর সংগ্রহ করা চাল, ডাল, আলু প্রভৃতি পূজার জন্য গ্রহণ করলেন না জয়রামবাটীর পূজাকর্তা নব মুখার্জি। ভক্তিমতী শ্যামাসুন্দরী তা

সারা বছর ধরে সঞ্চয় করেছেন, দেবীকে ভোগ দেবেন বলে। সেই নৈবেদ্য বাতিল হলো গ্রাম্য মোড়লের এক আদেশে। নীরবে চোখের জল ফেললেন শ্যামাসুন্দরী। 'মা কালীর জন্য চাল করেছি, এ চাল নিলে না। আমার এ চাল কে খাবে? এ কালীর চাল। এ চালতো কেউ খেতে পারবে না।' শুদ্ধ মনে ঢেঁকিতে কুটে তৈরি করেছেন চাল। শ্যামাসুন্দরী রাতে স্বপ্ন দেখেন, এক দেবী এসেছেন তাঁর কাছে, পরনে লাল শাড়ি, রক্তাভ রং গায়ের। চারটে হাত, পায়ের উপর পা তুলে সিংহের উপর বসে আছেন। শরীর থেকে জ্যোতি বেরুচ্ছে। দেবী বলছেন— 'ওরা চাল নেয়নি তো কী হয়েছে? কালীর চাল আমি নেবো। আমি জগদম্বা, জগদ্ধাত্রী রূপে তোমার পূজা নেবো।'

শ্যামাসুন্দরী তবুও বুঝতে পারলেন না। কন্যা সারদাকে জিজ্ঞাসা করেন,— লাল রং, পায়ে পা ঠেসান দিয়ে সিংহের উপর বসে আছে, ও কী ঠাকুর?

সারদা বলেন— ও জগদ্ধাত্রী।

শ্যামাসুন্দরী সেই বছরই জগদ্ধাত্রী পূজায় ব্রতী হলেন। মাত্র কদিন, কালীপূজা শেষ হয়েছে, মা জগদ্ধাত্রী আসছেন। কিন্তু প্রকৃতিতে নিম্ন চাপের ভ্রূকুটি, শুরু হলো অবিশ্রান্ত বর্ষণ, কীভাবে পূজা হবে? ধানই তো শুকনো হলো না। এদিকে প্রতিমা, পূজার জিনিসপত্রও সংগ্রহ করতে হবে। হঠাৎ তার মধ্যেই রোদ উঠল, চাটাইয়ে ধান শুকোচ্ছে। আগুন জ্বালিয়ে প্রতিমা শুকোনোর কাজ চললো। শ্যামাসুন্দরী পুত্রকে দিয়ে জামাইয়ের কাছে খবর পাঠালেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শুনে খুশি হলেন, —মা আসবেন? মা আসবেন? বেশ বেশ।

শ্যালক প্রসন্ন জামাইবাবুকে নিতে এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। তবে শ্রীরামকৃষ্ণ যেতে পারেননি ফেবার। বললেন— এই আমার যাওয়া হলো না, যা বেশ, পূজা করগে। বেশ বেশ তোদের ভালো হবে।

শ্যামাসুন্দরীর আয়োজনে জগদ্ধাত্রীপূজা সাড়ম্বরে সম্পন্ন হলো।

বঙ্গদেশে জগদ্ধাত্রী পূজা প্রচলনে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির ভূমিকা অবিস্মরণীয়। রাজবাড়িতে জগদ্ধাত্রী পূজা প্রচলনের পরে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রজারা চাষা পাড়ায় জগদ্ধাত্রী পূজার আয়োজন করেন যা 'বুড়িমার পূজা' নামে খ্যাত। জনৈক গোবিন্দ ঘোষ ঘট ও পটের পরিবর্তে প্রতিমায় এই পূজার প্রচলন করেন।

কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জগদ্ধাত্রী পূজার খ্যাতি অল্প দিনের মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর বঙ্গদেশে ক্রমে ক্রমে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজরা হিন্দুদের রীতিনীতির উপর সাধারণত হস্তক্ষেপ করতো না। কৃষ্ণনগরের রাজকীয় জগদ্ধাত্রীর জৌলুস ক্রমশ বাড়তে থাকে। বঙ্গদেশ ইংরেজ করতলগত হলেও গঙ্গাতীরের চন্দননগর ছিল ফরাসি উপনিবেশ। ফরাসি সরকারের দেওয়ান ছিলেন চন্দননগরের ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। তিনি ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ। একবার জগদ্ধাত্রী পূজায় আমন্ত্রিত হয়ে তিনি এলেন কৃষ্ণনগরে। জগদ্ধাত্রী পূজার আধ্যাত্মিকতা এবং জাঁকজম দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। পণ্ডিতদের কাছে পূজার রীতিনীতি জ্ঞাত হয়ে তিনি চন্দননগরে প্রথম জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর অবশ্য সেই পূজা সর্বজনীন হয়ে যায়। বর্তমানে চন্দননগরে ছোটো-বড়ো তিন শতাধিক পূজা হয়। প্রতিমা, মণ্ডপসজ্জা এবং অসাধারণ আলোকমালায় সজ্জিত জগদ্ধাত্রী পূজা সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজা দুর্গাপূজার মতো সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিনদিনে সম্পন্ন হয়। দশমীতে বিসর্জনের শোভাযাত্রা বিশেষ আকর্ষণীয়।

মা সারদার নির্দেশে বেলুড় মঠে এই পূজার প্রচলন করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং। বর্তমানে বিশ্বের সর্বত্র রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে শাস্ত্র বিধি মেনে, নিষ্ঠার সঙ্গে জগদ্ধাত্রী পূজা সম্পন্ন হয়।

দুর্গা বা কালীপূজার তুলনায় জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ে ঘটে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগরে প্রথম জগদ্ধাত্রী পূজা প্রচলন করার পরে ক্রমশ এই পূজার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এর কারণ অবশ্যই আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি। এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় হেমন্ত ঋতুতে। এই সময়ে গ্রাম বঙ্গের ঘরে ঘরে নতুন ধানের সমারোহ, মাঠে মাঠে শাক্‌সবজি। গ্রীষ্ম বর্ষার দুর্ভোগের অবসানে মানুষের হাতে অর্থ, মনে আনন্দ। আর এই সময়ে আনন্দময়ী জগদ্ধাত্রীর আগমনে মানুষতো মেতে উঠবেই।

দুর্গাপূজার মতো ক্ষেত্র বিশেষে জগদ্ধাত্রী পূজাতেও কুমারীপূজা একটি বিশেষ অঙ্গ। এই পূজায় কুমারী কন্যাকে দেবী জ্ঞানে অর্চনা করা হয়। মাতৃসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন— 'সব স্ত্রীলোক ভগবতীর এক একটি রূপ। তবে শুদ্ধাত্মা কুমারীতে ভগবতীর বেশি প্রকাশ।' শুদ্ধাত্মা ভাবটা মেয়েদের ক্ষেত্রে দুই থেকে দশ বছরের মধ্যে প্রকট ভাবে থাকে। এই জগতে একমাত্র ঈশ্বরচিন্তা ছাড়া কোনো জিনিসই পূর্ণ পবিত্র নয়। ভগবান স্বয়ং অগ্নিসম পবিত্র। আর তাঁর চিন্তা ভাবনাতেই কেবল পবিত্রতা লাভ হয়, অন্য কিছুতে নয়। এই কারণেই ঋতুবতী হওয়ার আগে শুদ্ধ স্বভাবের কন্যাদের মধ্যে প্রবল দৈবী শক্তি জাগ্রত থাকে। কুমারীপূজার মাধ্যমে কন্যাহৃদয়ের এই সুপ্ত দৈবীশক্তিকে জাগিয়ে মানুষের কল্যাণে নিয়োগ করার ভাবনা থেকেই কুমারীপূজার উৎপত্তি হয়েছে।

ভারতবর্ষে কুমারীপূজার ইতিহাস অতি প্রাচীন। প্রায় পৌরাণিক যুগ থেকে শক্তিপূজার সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎ নারায়ণী রূপে কুমারী পূজার প্রচলন চলে আসছে। তন্ত্রশাস্ত্রে কুমারীপূজার মাহাত্ম্য সবিস্তারে বর্ণিত আছে। এক্ষেত্রে দেবী ভাগবত, যামলতন্ত্র, দেবী পূরাণ, যোগিনীতন্ত্র, দেবী পূরাণ, যোগিনীতন্দ্র প্রভৃতি শাস্ত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে।

কুমারী পূজা হলো মূলত শক্তির উপাসনা। প্রত্যেক নারীই জগৎমাতার সাক্ষাৎ মূর্তি। শ্রীশ্রী চণ্ডীতে আছে— 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।' এই জগতে সমস্ত স্ত্রীমূর্তিই দেবীর স্বরূপ। তবে শুদ্ধ কুমারীতেই এই মহাশক্তি, দেবীর বেশী প্রকাশ।

দুর্গা হৈমবতী জগদ্ধাত্রী, আনন্দময়ী কল্যাণদায়িনী, কিন্তু যুগে যুগে আসুরিক শক্তিকে পযুদস্ত করার জন্য তিনি জাগ্রত হন, হয়ে ওঠেন ধ্বংসাত্মিকা। জগদ্ধাত্রী পূজার এই পুণ্যলগ্নে মায়ের কাছে প্রার্থনা—

ওঁ আধারভূতে চাধেয়ে ধৃতিরূপে ধুরন্ধরে।
ধ্রুবে ধ্রুবপদে ধীরে জগদ্ধাত্রী নমোহস্তুতে।।
শবাকারে শক্তিরূপে শক্তিস্থে শক্তি বিগ্রহে।
শাক্তাচারপ্রিয়ে দেবী জগদ্ধাত্রী নমোস্তুহতে।।

দিশাহীন পশুপালন নীতি : মড়কের গ্রাসে

ডঃ সর্বস্বরূপ ঘোষ

ভারতবর্ষের সামগ্রিক অর্থনীতি এবং পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে পশুপালন আজ আর নিছক কোনো প্রান্তিক পেশা নয়, বরং এটি গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম মূল চালিকাশক্তি। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, দেশের মোট কৃষি ও আনুষঙ্গিক খাতের গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড (GVA)-এর প্রায় ৩০ শতাংশই আসে পশুপালন খাত থেকে, যা জাতীয় জিডিপি-র প্রায় ৫ শতাংশ (তথ্যসূত্র-১)।

জাতীয় স্তরের এই পরিসংখ্যানের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের ছবিটা আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। এ রাজ্যে মাথাপিছু কৃষিজমির পরিমাণ অত্যন্ত কম এবং তা ক্রম-হ্রাসমান। ফলে পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র, প্রান্তিক এবং ভূমিহীন চাষিদের কাছে কৃষিকাজের চেয়েও অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য বিকল্প হয়ে উঠেছে গবাদি পশু, ছাগল, পোলট্রি এবং শূকর পালনের মতো প্রাণীপালন শিল্প। কিন্তু বিপুল সম্ভাবনাময় এই ক্ষেত্রটি আজ এক গভীর খাদের কিনারায়। প্রতি বছর মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়া পশুরোগ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতিকে আক্ষরিক অর্থেই পঙ্গু করে দিচ্ছে। 'লাম্পি স্কিন ডিজিজ', 'আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার' এবং বার্ড ফ্লুর প্রাদুর্ভাব আজ আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

তথ্যের অভাব নীতিগত উদাসীনতা : এই বিপুল ক্ষতির মূল কারণ ভাইরাসের মারণক্ষমতার চেয়েও নীতিগত উদাসীনতা ও তথ্যের অভাব। যেকোনো মহামারী মোকাবিলার প্রথম শর্ত হলো সঠিক পরিসংখ্যান। কিন্তু বিগত বছরগুলিতে রাজ্য প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের কাজের দিকে তাকালে এক অদ্ভুত অন্ধত্ব চোখে পড়ত। দপ্তরের কাছে পশু মৃত্যুর সঠিক কোনো রিয়েল-টাইম তথ্য থাকত না। এর একটি বড়ো কারণ হলো বিমা বা ইন্স্যুরেন্সের অভাব।

জাতীয় স্তরে গবাদি পশুর মাত্র ৫-৬ শতাংশ বিমার আওতাভুক্ত হলেও, পশ্চিমবঙ্গে এই হার আরও হতাশাজনক (তথ্যসূত্র-২)। ক্ষতিপূরণ পাওয়ার আশা না থাকায়, সাধারণ চাষি, পশু বা পাখির মৃত্যুর খবর সরকারি দপ্তরে নথিভুক্ত করার তাগিদ অনুভব করেন না। ফলে লাম্পি ভাইরাসে আক্রান্তের সরকারি হিসেবের সঙ্গে ন্যাশনাল ডেইরি Entwicklung বোর্ডের (NDDB) রিপোর্টের প্রকৃত সংখ্যার বিস্তর ফারাক থেকে যায় (তথ্যসূত্র-৩)। বসন্তকালে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে) পোলট্রিতে মৃত্যুর হার যেখানে ৩-৫ শতাংশ থাকার কথা, সেখানে এই রাজ্যে তা বেড়ে ক্ষেত্রবিশেষে ৭০-১০০ শতাংশে গিয়ে দাঁড়াত।

বিগত সরকারগুলির দীর্ঘস্থায়ী নীতি-শূন্যতা : পশ্চিমবঙ্গে পশুপালন খাতের এই বেহাল দশার দায় কোনো আকস্মিক ত্রুটি নয়, বরং এটি গত পাঁচ দশকের এক দীর্ঘস্থায়ী নীতি-শূন্যতার চূড়ান্ত ফল। বিগত বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনকালে কৃষিনীতির মূল ফোকাস ছিল শুধুমাত্র 'অপরেশন বর্গা'-তে। গুজরাটে যখন 'আমূল' বা কর্ণাটকে 'নন্দিনী'-র মতো বিশাল দুগ্ধ সমবায় বিপ্লব ঘটছিল, তখন পশ্চিমবঙ্গে পশুপালনকে কেবল প্রান্তিক চাষির 'বাড়তি আয়ের' তকমা দিয়ে রাখা হয়েছিল। এর পরবর্তীকালে, গত ১৫ বছরের সদ্যপ্রাক্তন তৃণমূল সরকারের আমলেও সেই কাঠামোগত দুর্বলতা কাটেনি। আধুনিক ল্যাবরেটরি বা জেনেটিক আপগ্রেডেশনের বদলে— রাজ্যের নীতি আটকে ছিল কেবল ছাগল বা মুরগি ছানা বিতরণের মতো কিছু স্বল্পমেয়াদি জনমোহিনী প্রকল্পে। ছানা বিতরণের পর সেই প্রাণীটির স্বাস্থ্যরক্ষা বা মড়ক ঠেকানোর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়নি।

পাশাপাশি, স্বাধীনতার পর থেকে বিগত কেন্দ্রীয় সরকারগুলির আমলেও বাজেটে কৃষি মন্ত্রকের বিপুল বরাদ্দের তুলনায় প্রাণী সম্পদের জন্য বরাদ্দ ঐতিহাসিকভাবেই উপেক্ষিত থেকেছে। যদিও বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার 'ন্যাশনাল লাইভস্টক মিশন' (এনএলএম)-এর মতো প্রকল্পের মাধ্যমে এই বৈষম্য কাটানোর নিরন্তর চেষ্টা করছে, তবুও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রকের বাজেট বরাদ্দ এখনো কৃষির তুলনায় অনেকটাই কম (তথ্যসূত্র-৪)। এই দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত কাঠামোগত দুর্বলতা কাটাতে এবং পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে রাজ্যের নবগঠিত সরকারের সামনে এখন সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের একটি বড়ো সুযোগ রয়েছে।

সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায়

শুধুমাত্র সমস্যার আলোচনা নয়,

এই গভীর সঙ্কট থেকে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতিকে বাঁচাতে হলে আমাদের রাজ্যের নবনির্বাচিত সরকারকে অবিলম্বে নিম্নলিখিত গঠনমূলক পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা জরুরি :

• **১. পরিকাঠামো ও কোল্ড চেইন আধুনিকীকরণ :** গ্রামীণ খামারিদের কাছে প্রশাসনের প্রধান মুখ হলেন ব্লক লাইভস্টক ডেভেলাপমেন্ট অফিসার (বিএলডিও)। রাজ্যের প্রতিটি বিএলডিও অফিসে ন্যূনতম ল্যাবরেটরি পরিকাঠামো এবং ভ্যাকসিনের 'কোল্ড চেইন' বজায় রাখার জন্য নিরবছিন্ন বিদ্যুতের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে।

• **২. উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ ও পিপিপি (পিপিপি) মডেল :** চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) এবং ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি)-এর মতো আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি। পোলট্রির ক্ষেত্রে সিসিটিভি ক্যামেরা এবং এআই অ্যালগরিদমের মাধ্যমে অসুস্থ মুরগিকে দ্রুত চিহ্নিত করা সম্ভব। এই ব্যয়বহুল প্রযুক্তির বাস্তব রূপায়ণের জন্য সরকারি পরিকাঠামোর পাশাপাশি পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) মডেল এবং কর্পোরেট ফান্ডিং (সিএসআর) বৃদ্ধি করতে হবে।

• **৩. কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র (কেভিকে)-র ক্ষমতায়ন :** ল্যাবরেটরির আধুনিক বিজ্ঞানকে সরাসরি গোয়ালে বা প্রান্তিক খামারিদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে প্রতিটি জেলার 'কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র' (কেভিকে)-গুলিকে নতুন আর্থিক তহবিল ও কারিগরি শক্তি দিয়ে শক্তিশালী করতে হবে। কেভিকে-র সক্রিয় ভূমিকা ছাড়া আইসিএআর (আইসিএআর)-এর মতো প্রতিষ্ঠানের গবেষণার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

• **৪. বিমা কভারেজ ও সচেতনতা বৃদ্ধি :** মহামারীতে খামারিদের পথে বসা আটকাতে পশুর বিমা বা ইনস্যুরেন্স কভারেজ বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং এর প্রিমিয়ামে সরকারি ভরতুকির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

পশুপালন পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতির একটি মহৎ শিল্প। আজ যদি আমরা পশুপালকদের হাতে সঠিক বাজেট, আধুনিক পরিকাঠামো ও প্রযুক্তির বর্ম তুলে দিতে পারি, তবেই আগামী দিনে গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদণ্ড সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে।

তথ্যসূত্র : 1. Economic Survey of India (2022-23), Ministry of Finance and Annual Report (2023-24), Department of Aninal Husbandry and Dairying (DAHD). 2. Annual Report (2022-23), Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI); and Report of the Parliamentary Standing Committee (2022-23). 3. Lumpy Skin Disease (LSD) Outbreak Status Report (2022), DAHD, Govt. of India. 4. Union Budget Document (2024-25), Ministry of Finance, Government of India.

(লেখক প্রাণী পালন বিশেষজ্ঞ ও প্রাবন্ধিক)

With Best Compliments Form -

A
Well Wisher



খেলাধুলা— সেকাল-একাল

স্নেহাংশু আচার্য

'সুস্থ দেহে সুস্থ মন বাস করে।' —এই প্রবাদটির মধ্যেই খেলাধুলার গুরুত্ব সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

খেলাধুলা মানুষের জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ। এটি মানুষের শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখে এবং মনকে প্রফুল্ল করে। যুগে যুগে মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলার ধরনেও পরিবর্তন এসেছে। তাই সেকালের খেলাধুলা ও এখনকার খেলাধুলার মধ্যে অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

সেকালে মানুষ প্রধানত গ্রামে বসবাস করত। তখন খোলা মাঠ, নদীর তীর ও বিস্তীর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশু-কিশোররা বিভিন্ন ধরনের দেশীয় খেলাধুলা করত। হা-ডু-ডু, কাবাডি, গোল্লাছুট, দাঁড়িয়াবান্ধা, লাঠিখেলা, কানামাছি ও বউচি ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। এসব খেলায় কোনো ব্যয়বহুল সরঞ্জামের প্রয়োজন হতো না। বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীরা একত্রে খেলত বলে পারস্পরিক সম্পর্কও দৃঢ় হতো। শারীরিক পরিশ্রম বেশি হওয়ায় খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যও ভালো থাকত।

বর্তমানে খেলাধুলার জগতে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খেলা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কারণে মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের খেলা সহজেই দেখতে পারে। বর্তমানে খেলাধুলায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা করা হয়। ভিডিয়ো রেফারি, ডিআরএস এবং বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ পদ্ধতির কারণে খেলা আরও আকর্ষণীয় ও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠেছে। তবে প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কিছু নেতিবাচক পরিবর্তনও দেখা গেছে। বর্তমানে অনেক শিশু ও কিশোর মোবাইল ফোন, কম্পিউটার ও ভিডিয়ো গেমে বেশি সময় ব্যয় করে। ফলে মাঠে গিয়ে খেলাধুলা করার প্রবণতা কমে যাচ্ছে। এর কারণে শারীরিক ব্যায়াম কম হচ্ছে এবং নানা স্বাস্থ্যসমস্যা দেখা দিচ্ছে। অন্যদিকে, সেকালে শিশুদের অধিকাংশ সময় মাঠে কাটত, যা তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। 'খেলাধুলা শৃঙ্খলা ও নেতৃত্বের শিক্ষা দেয়।' খেলাধুলার মাধ্যমে মানুষ নিয়মানুবর্তিতা, সহযোগিতা, ধৈর্য ও পরিশ্রমের শিক্ষা লাভ করে। জয়-পরাজয়কে মেনে নেওয়ার মানসিকতাও তৈরি হয়।

সেকালের খেলাধুলা ছিল সহজ, আনন্দময় এবং সমাজভিত্তিক। এখনকার খেলাধুলা অধিক পেশাদার, প্রযুক্তিনির্ভর এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিস্তৃত। উভয় যুগের খেলাধুলারই নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে। আধুনিক খেলাধুলার পাশাপাশি আমাদের দেশীয় খেলাগুলোকেও সংরক্ষণ ও জনপ্রিয় করে তোলা উচিত।

পরিশেষে বলা যায়, সেকালের খেলাধুলা ও এখনকার খেলার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও উভয়ের লক্ষ্য একই— মানুষকে সুস্থ, কর্মক্ষম ও আনন্দময় জীবন উপহার দেওয়া। তাই আমাদের উচিত মোবাইল ও প্রযুক্তির প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি কমিয়ে নিয়মিত মাঠে খেলাধুলা করা এবং দেশীয় ও আধুনিক উভয় ধরনের খেলাকে সমান গুরুত্ব দেওয়া। 'খেলাধুলা মানুষের চরিত্র গঠনের অন্যতম মাধ্যম।' তাই সুস্থ ও সুন্দর জীবন গড়তে প্রত্যেকেরই খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী হওয়া উচিত। □

মোরগ, কুকুর ও শেয়ালের কথা

এক বনে একটি কুকুর ও একটি মোরগ বাস করত। তাদের দুজনের মধ্যে খুব ভাব। তাদের মধ্যে এরকম ব্যবস্থা ছিল, রাত্রিবেলা মোরগটি যখন ঘুমুবে, তখন কুকুরটি তাকে পাহারা দেবে। আবার দিনের বেলা কুকুরটি যখন ঘুমুবে তখন মোরগটি তার দিকে নজর রাখবে। সেই মতো মোরগ রাত্রিবেলা গাছের ওপর ঘুমিয়ে পড়ত আর কুকুর সারারাত্রি জেগে পাহারা দিত। মোরগ ভোরবেলা জেগে উঠলে কুকুরটি গাছের নীচে ঘুমিয়ে পড়ত।

একদিন রাত্রি কেটে ভোরের আলো ফুটে উঠতেই মোরগ স্বভাবশত উচ্চৈঃস্বরে ডেকে উঠল। কুকুর সেই ডাক শুনে গাছের নীচে ঘুমিয়ে পড়ল। ওদিকে দূর থেকে একটা শেয়াল ওই মোরগের ডাক শুনতে পেল। সে ছুটতে ছুটতে এসে গাছের ডালে মোরগকে বসে থাকতে দেখতে পেল।

শেয়াল মেনে মনে ভাবল এটাকে আজ খেতে হবে। সে মনে মনে ফন্দি আঁটল, কীভাবে মোরগটাকে গাছ থেকে নামানো যায়। কাঁটাগাছে ওঠা শেয়ালের পক্ষে সম্ভব নয়।

বেশ খানিকক্ষণ চিন্তা করে শেয়াল গাছের কাছাকাছি এল। চিৎকার সে মোরগের সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করতে লাগল। সে মোরগকে ডেকে বলল, ভাই, তুমি খুব সুন্দর পাখি। ভোরবেলা জেগে ওঠো, কী সুন্দর গান করো। এসো না ভাই নীচে নেমে। তোমার সুন্দর গলায় একটু গান শুনি।

এদিকে মোরগ বেশ বুঝতে পেরেছে যে, শেয়ালের এত উৎসাহের কারণ কী। সে নিশ্চয় তাকে খেতে চায়। তাই এত ফন্দি করছে। তখন সে শেয়ালকে ডেকে বলল, ভাই, তুমি যে আমার মতো সামান্য পাখিকে বন্ধু বলে পেতে চাইছো, এ আমার পরম সৌভাগ্য। তোমার মতো বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ প্রাণীকে বন্ধু হিসেবে কি সবাই পেতে পারে? তুমি এই গাছের নীচে এসে বসো, আমি এক্ষুনি নেমে আসছি।

মোরগের কথা শুনে শেয়াল তো আহ্লাদে আটখানা। মোরগটা তাকে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ বলেছে। কেউ তাকে বুদ্ধিমান বললে শেয়ালের খুব আনন্দ হয়। সে মনের আনন্দে লাফাতে লাফাতে গাছের একেবারে নীচে চলে এল। মোরগের মাংস খাওয়ার লোভ কে কোথায় আছে কোনো কিছুই তার মাথাতেই এল না।

এদিকে গাছের নীচে মোরগের বন্ধু কুকুর শুয়ে ছিল। সে তো শেয়ালকে দেখেই বুঝে গেল, নিশ্চয়ই তার বন্ধু মোরগকে খাওয়ার মতলবে শেয়ালটি এখানে এসে পড়েছে। কুকুরটি আর দেরি না করে শেয়ালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁচড়ে কামড়ে তাকে শেষ করে দিল।

শেয়ালটি জানতো না যে, পরের ক্ষতি করার চেষ্টা করলে নিজেরই ক্ষতি এমনকী মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তার ভাগ্যেও তাই-ই ঘটল।

সংগৃহীত

With Best Compliments Form -

A

Well Wisher

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ পরিচয়

মহাকালেশ্বর



মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী শহরে ক্ষিপ্রানদীর তীরে অবস্থিত মহাকালেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ। ১২৩৪-৩৫ সালে এই মন্দির সুলতান ইলতুতমিস লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে। অষ্টাদশ শতকে মারাঠা সেনাপতি রণোজিরাও সিন্ধে পুনর্নির্মাণ করান। এটি একমাত্র যা দক্ষিণমুখী জ্যোতির্লিঙ্গ। দক্ষিণ দিক মৃত্যুর দেবতা যমের দিক হওয়ায় এখানে মহাদেবের নাম মহাকালেশ্বর। মন্দিরটি পাঁচতলা বিশিষ্ট, একটি তল ভূগর্ভস্থ (গর্ভগৃহ)। দ্বিতীয় তলায় ওঙ্কারেশ্বর এবং তৃতীয় তলায় নাগচন্দ্রেশ্বরের মূর্তি রয়েছে। সম্প্রতি মন্দিরের পাশে তৈরি করা হয়েছে বিশাল আকৃতির 'মহাকাল লোক' কড়িডোর। এই মন্দিরে ভোর চারটায় শ্মশানের চিতাভস্ম দিয়ে সম্পন্ন হয় 'ভস্ম আরতি'। এটি ভক্তদের প্রধান আকর্ষণের বিষয়।

এসো সংস্কৃত শিখি-১২৭

দশদিবসেষু সংস্কৃতং বদতু
দ্বিতীয়দিবসঃ

কুতঃ—কোথা থেকে। **ইতঃ**—এখান থেকে। **ততঃ**—ওখান বা সেখান থেকে। সা কুতঃ আগচ্ছতি?—সে (স্ত্রী) কোথা থেকে আসছে? অহম্ ইতঃ তত্র গচ্ছামি।— আমি এখান থেকে ওখানে যাচ্ছি। সঃ ততঃ অত্র আগচ্ছতি। — সে (পুং) ওখান থেকে এখানে আসছে। ভবান্ কুতঃ আগচ্ছতি?--আপনি কোথা থেকে আসছেন? অহম্ গৃহতঃ আগচ্ছামি— আমি বাড়ি থেকে আসছি।

এভাবে বাক্য রচনা করতে হবে।

ভালো কথা

মামাবাড়ির আনন্দ

লক্ষ্মীপূজার দিন আমি বাবা-মায়ের সঙ্গে মামার বাড়ি গিয়েছিলাম। সন্ধ্যায় পৌঁছেই একটু কিছু খেয়ে পরদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যেমন খুশি সাজো-র জন্য বাবা খড় দিয়ে গদা ও লেজ বানিয়ে রাখলেন। পরদিন সকালে শুরু হলো অঙ্কন প্রতিযোগিতা। একই সময়ে চলল রক্তদান শিবির ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা। বিকেলে আমি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও যেমন খুশি সাজো' দুটোতেই অংশগ্রহণ করেছিলাম। প্রথমে আবৃত্তি হয়ে যাওয়ার পর যেমন খুশি সাজোতে আমি পবনপুত্র হনুমান সেজেছিলাম। সন্ধ্যায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অনেক গুণী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কথা আমার খুব ভালো লেগেছে। আবৃত্তিতে আমি দ্বিতীয় এবং যেমন খুশি সাজোতে পঞ্চম হয়েছি। তারপর দিন পাঁচটি শীতলামাতার পূজা এবং ফিরিয়ে দেওয়া ও মহোৎসব আর তার পরদিন মা লক্ষ্মীর ভাসান অনুষ্ঠান হলো। আমি এবার মামার বাড়িতে খুব আনন্দ উপভোগ করলাম।

দীপমাল্য সাউ,ষষ্ঠশ্রেণী, রাধা-মাধব সাহা লেন, কলকাতা-৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ম চী বা না	(১) চ ন ন ত্র হ রি
(২) ন জ মা ন	(২) র্বা ন স চি র নি

৩১ অক্টোবর সংখ্যার উত্তর
(১) অতিকথন (২) অতিচালাকি

৩১ অক্টোবর সংখ্যার উত্তর
(১) অকথাকুকথা (২) অকালবোধন

(১) কৃত্তিকা মণ্ডল, মকদুমপুর, মালদা। (২) শ্রেয়া মহান্তি, বরাবাজার, পুরুলিয়া। (৩) শ্যামল চৌধুরী, বরানগর, কলকাতা-৩৬। (৪) সুকান্ত সেন, ঝালদা, পুরুলিয়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery



PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রুপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond



মহাবিশ্বের সুর ও ড. অশোক সেন

তারতত্ত্বের গোলকধাঁধায় ভারতের আলোর দিশারি

ডঃ অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

আইজ্যাক নিউটনের মাথায় আপেল ঝরে পড়ার গল্প আমরা অনেকেই পড়েছি। মহাকর্ষের সেই চিরন্তন সূত্রে ভর করেই পৃথিবীর বুকে বৃষ্টি নামে, সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে আমাদের গ্রহমণ্ডলী। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সূচনায় পদার্থবিজ্ঞানের মানচিত্রে দেখা দিল এক মহা তরঙ্গ। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের মাধ্যমে দেখালেন, মহাকর্ষ আসলে স্থান-কালের বাঁক মাত্র। নক্ষত্র, ছায়াপথ আর মহাবিশ্বের বিশাল পরিমণ্ডলে আইনস্টাইনের এই নিয়মই শেষ কথা।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের আর এক মেরুতে উন্মোচিত হলো কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান— যার রাজত্ব পরমাণুর ভেতরের অতিপারমাণবিক জগতে, ইলেকট্রন, প্রোটন আর কোয়ার্কের জগতে। সমস্যা বাধল সেখানেই। পদার্থবিজ্ঞানীরা দেখলেন, মহাবিশ্বের এই দুই প্রধান নিয়ম কিছুতেই একে অপরের সঙ্গে হাত মেলাতে পারছে না। নক্ষত্র বা ছায়াপথের মতো বিশাল বস্তুর গণিত যেখানে নিখুঁত কাজ করে, পারমাণবিক স্কেলে আইনস্টাইনের সেই মহাকর্ষ সমীকরণ বসালেই গাণিতিক উত্তর আসতে শুরু করে 'অসীম'— পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় যা এক মহাজাগতিক ট্রাফিক জাম!

পদার্থবিজ্ঞানের এই সবচেয়ে বড়ো অমীমাংসিত ধাঁধা বা 'থিয়োরি অব এভরিথিং'-এর খোঁজে আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে অগ্রগামী হাতিয়ার হলো 'স্ট্রিং থিয়োরি' বা তারতত্ত্ব। আর সেই বিশ্বজোড়া জটিল গাণিতিক গবেষণার যিনি অগ্রভাগে রয়েছে, তিনি আমাদের দেশেরই কৃতী সন্তান, তত্ত্বীয় পদার্থবিদ অধ্যাপক অশোক সেন। ১৯৯৮ সালে যুক্তরাজ্যভিত্তিক রয়্যাল সোসাইটির ফেলেশিপ অর্জন থেকে শুরু করে ২০২৬ সালে সুইডেনের মর্যাদাপূর্ণ 'অস্কার ক্লেইন মেডেল'— আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে ভারতের এই নামটিকে পৌঁছে দিয়েছেন তিনি।

তারতত্ত্ব বা স্ট্রিং থিয়োরি কী?

নবম ও দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ে আপনারা পড়েছেন যে, আমাদের চারপাশের সব কিছু পরমাণু দিয়ে তৈরি। পরমাণুকে ভাঙলে পাওয়া যায় ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। আরও গভীরে গেলে প্রোটন ও নিউট্রন তৈরি হয় কোয়ার্ক দিয়ে। প্রচলিত

ফঃ ৬

পদার্থবিজ্ঞানে এই প্রোটন, ইলেকট্রন বা কোয়ার্ককে ধরা হয় শূন্য-মাত্রায় নিরেট বিন্দু বা 'পয়েন্ট পার্টিকেল' হিসেবে।

স্ট্রিং থিয়োরি বা তারতত্ত্ব এই ধারণাকেই এক ধাক্কায় বদলে দিল। এই তত্ত্ব বলে, জগতের মৌলিক কণাগুলো আসলে কোনো নিরেট বিন্দু নয়; তারা হলো চরম আণুবীক্ষণিক শক্তির স্পন্দিত সুতো বা তারের লুপ।

বিষয়টি বুঝতে একটি বেহালা বা গিটারের কথা ভাবতে হবে। একটি গিটারের তারে আঙুলের ছোঁয়া কীভাবে দেওয়া হচ্ছে এবং তার কম্পন কেমন হচ্ছে, তার ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন সুর তৈরি হয়। স্ট্রিং থিয়োরি অনুযায়ী, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হলো একটি বিশাল মহাসঙ্গীত। এই শক্তির তারগুলো যদি একভাবে কাঁপে, তবে তা আচরণ করে ইলেকট্রনের মতো; অন্যভাবে কাঁপলে তা হয়ে ওঠে কোয়ার্ক; আর যদি অন্য এক বিশেষ ছন্দে কম্পিত হয়, তবে জন্ম নেয় 'গ্র্যাভিটন'— যে কণা মহাকর্ষ বল বহন করে!

তবে এই তত্ত্বের একটা অদ্ভুত শর্ত আছে। আমাদের চোখ কেবল ত্রিমাত্রিক স্থান (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা) এবং সময়— এই চার মাত্রা বোঝে। কিন্তু স্ট্রিং থিয়োরির গাণিতিক সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হলে মহাবিশ্বে অতিরিক্ত ৬ বা ৭টি মাত্রা থাকা জরুরি, অর্থাৎ মোট ১০ বা ১১টি মাত্রা বা ডাইমেনশন।

কোথায় লুকিয়ে আছে সেই অতিরিক্ত মাত্রাগুলো? কল্পনা করা যাক, অনেক দূর থেকে দেখা একটি জলের পাইপকে মনে হয় একমাত্রিক একটি সরু রেখা। কিন্তু আপনি যদি পাইপটির একদম কাছে যান, দেখবেন তার পরিধি ঘিরে গোল একটি অতিরিক্ত মাত্রা রয়েছে, যার গায়ে একটি ছোটো পিঁপড়ে ঘুরে বেড়াতে পারে। বিজ্ঞানী ড. অশোক সেন ও তাঁর সহকর্মীদের মতে, স্ট্রিং থিয়োরি-বর্ণিত অতিরিক্ত মাত্রাগুলো মহাবিশ্বের প্রতিটি বিন্দুতে এত ক্ষুদ্রভাবে পেঁচিয়ে লুকিয়ে রয়েছে যে আমাদের খালি চোখে বা সাধারণ যন্ত্রে তা ধরা পড়ে না।

পাঁচটি জগতের এক সুর এবং 'এস-ডুয়ালিটি'

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে স্ট্রিং থিয়োরি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা এক বিরাট ফাঁপরে পড়লেন। সমীকরণ কষতে গিয়ে তাঁরা দেখলেন, স্ট্রিং থিয়োরির একটি নয়, বরং পাঁচটি আলাদা আলাদা গাণিতিক সংস্করণ তৈরি হয়ে গেছে। বিজ্ঞানীদের মধ্যে তর্ক বাধল— আমাদের বাস্তব মহাবিশ্বকে তবে কোনটি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে? এটি ঠিক অন্ধের হস্তীদর্শনের মতো। আঁধার ঘরে পাঁচজন মানুষ একটি বিশালাকার হাতিকে আলাদা আলাদা জায়গা থেকে ছুঁয়ে দেখছিল। একজন হাতির শুঁড় ধরে বলল এটি একটি সাপ, অন্যজন পা ধরে বলল এটি গাছের গুঁড়ি।

এই বিশ্বজোড়া সংশয় ও বিভ্রান্তির মধ্যে আলো নিয়ে এলেন অধ্যাপক অশোক সেন। তিনি উন্নত বীজগণিত ও গাণিতিক কাঠামো ব্যবহার করে প্রমাণ করলেন, এই পাঁচটি আলাদা সংস্করণ আসলে ভিন্ন কোনো মহাবিশ্ব নয়— তারা একই সত্যের পাঁচটি ভিন্ন গাণিতিক প্রকাশ মাত্র। পদার্থবিজ্ঞানে এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের নাম 'এস-ডুয়ালিটি'।

অধ্যাপক সেন একটি গাণিতিক 'জাদুদর্পণ' উদ্ভাবন করলেন। তিনি দেখালেন, একটি তত্ত্বে যেখানে তারগুলোর মধ্যে বল বা সংযোগ অত্যন্ত প্রবল, সেটিকে যেন এর সূত্র দিয়ে উলটে দিলেই তা রূপ নেয় অন্য একটি তত্ত্বে। যেখানে বল অত্যন্ত দুর্বল। এই ডুয়ালিটি বা দ্বৈততা প্রমাণ করে দিল যে স্ট্রিং থিয়োরি গাণিতিকভাবে একটিই অখণ্ড তত্ত্ব। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকীগুলোতে তাঁর এই কাজকে আখ্যা দেওয়া হয় 'প্রথম স্ট্রিং বিপ্লব'-এর পর পরবর্তী বড়ো মহাসংযোগ হিসেবে।

কৃষ্ণগহ্বরের অন্দরমহল এবং এন্ট্রপি ফাংশন ফর্মালিজম

কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাক হোল মহাবিশ্বের এমন এক দানবীয় স্থান, যার মহাকর্ষ বল এত তীব্র যে আলো পর্যন্ত সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। আপনারা জানেন, আলো সেকেন্ডে প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার বেগে ধায়। যে বস্তুর মুক্তিবেগ আলোর বেগের চেয়ে বেশি হয়, সেখানেই তৈরি হয় ঘটনা দিগন্ত।

বিখ্যাত তাত্ত্বিক পদার্থবিদ স্টিফেন হকিং ১৯৭০-এর দশকে প্রমাণ করেছিলেন যে কৃষ্ণগহ্বর একেবারে মৃত বা নিথর নয়; তারও একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা রয়েছে এবং রয়েছে বিশৃঙ্খলার পরিমাণ বা 'এন্ট্রপি'। কিন্তু সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের নিয়মে কৃষ্ণগহ্বরের ভেতরের সব পদার্থ দুমড়ে-মুচড়ে একটি অসীম ঘনত্বের বিন্দুতে পরিণত হয়। ফলে তার ভেতরের আণুবীক্ষণিক গঠন কেমন বা কীভাবে এন্ট্রপি তৈরি হচ্ছে, তা হিসেব করার কোনো উপায় বিজ্ঞানের কাছে ছিল না। ডঃ অশোক সেন এখানেও পথ দেখালেন। তিনি উদ্ভাবন করলেন 'এন্ট্রপি ফাংশন ফর্মালিজম'।

একটি ডিজিটাল ছবিকে যেমন দূর থেকে ঝাপসা মনে হলেও জুম করলে ছোটো ছোটো পিক্সেল দেখা যায়, ড. অশোক সেনের গাণিতিক পদ্ধতি তেমনই এক মহাজাগতিক হাই-রেজোলিউশন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মতো কাজ করল। তিনি কৃষ্ণগহ্বরের বাহ্যিক মহাকর্ষীয় এন্ট্রপির সঙ্গে ভেতরের কোয়ান্টাম অবস্থার নিখুঁত মিল গাণিতিকভাবে প্রমাণিত হলো। এটি কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান এবং আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্বের সংযোগস্থলে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক।

সৃষ্টির আদিমুহূর্তের সন্ধান

অধ্যাপক সেনের গবেষণার পরিধি কেবল এস-ডুয়ালিটি বা কৃষ্ণগহ্বরেই থেমে থাকেনি। তিনি কাজ করেছেন 'স্ট্রিং ফিল্ড থিয়োরি' এবং অস্থিতিশীল ডি-ব্রেন-এর ওপর। তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর একটি সুপরিচিত তত্ত্ব হলো 'সেন কনজেকচার'। এটি খোলা স্ট্রিং-এর 'ট্যাকিয়ন কনডেনসেশন' প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করে। সহজ ভাষায় বললে, মহাবিশ্বের সৃষ্টির আদি মুহূর্তে বা চরম শক্তিস্তরে কীভাবে মহাজাগতিক স্ট্রিং মৌলিক কণাগুলো একে অপরের সঙ্গে সংযোগ করে স্থান-কালের বুনন তৈরি করেছিল, সেন কনজেকচার সেই মহাজাগতিক ইতিহাস বুঝতে সাহায্য করে। পদার্থবিদ্যার গবেষকদের কাছে এটি স্ট্রিং কসমোলজির এক অপরিহার্য চাবিকাঠি।

অস্কার ক্লেইন পদক (২০২৬)

তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় অধ্যাপক সেনের এই অবদানের স্বীকৃতি

এসেছে বিশ্বমঞ্চের সর্বোচ্চ স্থান থেকে : ১. অস্কার ক্লেইন পদক (২০২৬) : ২০২৬ সালের অক্টোবরে সুইডেনের স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয় এবং নোবেল কমিটির যৌথ পর্যালোচনায় অধ্যাপক অশোক সেনকে ২০২৬ সালের অস্কার ক্লেইন পদকে ভূষিত করা হয়। তিনি প্রথম ভারতীয় পদার্থবিদ যিনি এই পরম সম্মান অর্জন করলেন। অস্কার ক্লেইন মেডেলের ইতিহাসে স্টিফেন হকিং, পিটার হিগস, স্টিভেন ওয়াইনবার্গ কিংবা চেন-নিং ইয়াং-এর মতো কিংবদন্তিদের পাশে এখন উজ্জ্বলভাবে খোদাই করা হলো ভারতীয় বিজ্ঞানী ড. অশোক সেনের নাম। পুরস্কার গ্রহণ উপলক্ষ্যে স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালবাভোনা সেন্টারে তিনি ঐতিহাসিক স্মারক বক্তৃতা দেন, যার শিরোনাম ছিল : 'Gravity from Strings and Strings from Gravity'।

২. ফান্ডামেন্টাল ফিজিক্স ব্রেকথ্রু প্রাইজ (২০১২) : বিশ্ববিজ্ঞানের সবচেয়ে অর্থবহুল পুরস্কার 'ব্রেকথ্রু প্রাইজ'-এর উদ্বোধনী বছরেই (২০১২) স্ট্রিং থিয়োরি ডুয়ালিটির অনন্য কাজের জন্য তিনি এই সম্মান পান।

৩. ডিরাক মেডেল (২০১৪) : আন্তর্জাতিক তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞান কেন্দ্র (আইসিটিপি) থেকে লাভ করেন ঐতিহাসিক ডিরাক মেডেল।

৪. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি : ১৯৯৮ সালে মাত্র ৪২ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক রয়্যাল সোসাইটির ফেলো (এফআরএস) নির্বাচিত হন। ভারত সরকার তাঁকে সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'পদ্মশ্রী' (২০০১) এবং 'পদ্মভূষণ' (২০১৩) খেতাবে ভূষিত করে।

প্রেসিডেন্সি থেকে আইসিটিএস ব্যাঙ্গালোর : দেশীয় মাটিতে বিশ্বজয়ের রূপকথা :

অধ্যাপক সেনের শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে (বর্তমান প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়)। ১৯৭৫ সালে পদার্থবিদ্যায় অনার্স-সহ বিএসসি পাশ করার পর তিনি কানপুর আইআইটি থেকে এমএসসি সম্পন্ন করেন। এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপরিচিত স্টোনি ব্রুক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জন করেন পিএইচডি ডিগ্রি।

বিদেশে গবেষণার পর তিনি দীর্ঘকাল কাজ করেছেন ফার্মিল্যাব, স্ল্যাক এবং মুম্বইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ-এ। পরবর্তীকালে বহু বছর প্রয়াগরাজের হরিশ চন্দ্র রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এ স্বনামধন্য অধ্যাপক হিসেবে মৌলিক গবেষণা চালিয়েছেন। বর্তমানে তিনি ব্যাঙ্গালোরের আন্তর্জাতিক তত্ত্বীয় বিজ্ঞান কেন্দ্র বা 'আইসিটিএস'-এ কর্মরত। পাশ্চাত্যের বড়ো বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের লোভনীয় অফার সত্ত্বেও অধ্যাপক সেন অধিকাংশ সময় ভারতের মাটিতে বসেই এই নোবেল-মানের বিশ্বজয়ী গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। তাঁর এই উপস্থিতি ভারতের বিজ্ঞানমনস্ক যুবসমাজকে দেখিয়ে দিয়েছে যে নিজের দেশে বসেই বিশ্বসেরা গবেষণা করা সম্ভব। আজ ভারতে যে 'ন্যাশনাল কোয়ান্টাম মিশন' বা উচ্চ তাপমাত্রার সুপারকন্ডাক্টর ও কোয়ান্টাম কম্পিউটিং নিয়ে গবেষণা চলছে, তার গাণিতিক ও কোয়ান্টাম ভিত রচনায় ড. অশোক সেনের কাজ এক পরোক্ষ আলোর উৎস হিসেবে কাজ করছে।

আগামীর পদার্থবিদদের জন্য দিশা

আপনারা যারা আজ দশম শ্রেণীতে পড়ছেন এবং মহাবিশ্বের এই অপার রহস্য উন্মোচনের স্বপ্ন দেখছেন, আপনাদের জন্য অধ্যাপক সেনের জীবন ও গবেষণা এক বিরাট অনুপ্রেরণা। কিন্তু তাত্ত্বিক পদার্থবিদ হতে গেলে দশম শ্রেণীর পর থেকে কীভাবে প্রস্তুতি নেবেন?

১. একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর বিষয় নির্বাচন

● **পদার্থবিজ্ঞান :** মেকানিক্স (গতিবিদ্যা ও বলবিদ্যা) এবং তড়িৎ-চুম্বকত্ব ভালো করে বুঝতে হবে। এগুলোই হলো কোয়ান্টাম ও আপেক্ষিকতাবাদের প্রাথমিক ভিত।

● **গণিত :** পদার্থবিদ্যার নিজস্ব ভাষা হলো গণিত। একাদশ-দ্বাদশে ক্যালকুলাস এবং ভেক্টর ও ম্যাট্রিক্সের মতো বিষয়গুলোতে গভীর দখল তৈরি করতে হবে।

● **কম্পিউটার সায়েন্স :** পাইথন বা সি++ প্রোগ্রামিং শেখা অত্যন্ত কার্যকর, কারণ আধুনিক গবেষণায় জটিল সমীকরণ সমাধানে কোডিং আবশ্যিক।

২. উচ্চশিক্ষার প্রবেশিকা পরীক্ষা ও শীর্ষ প্রতিষ্ঠানসমূহ

দ্বাদশ শ্রেণীর পর ভারতের সেরা বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রধান পরীক্ষাগুলো হলো :

● **আইএটি :** এর মাধ্যমে ভারতের সাতটি আইআইএসইআর এবং ঐতিহ্যবাহী আইআইএসসি ব্যাঙ্গালোরে ৫ বছরের সমন্বিত বিএস-এমএস কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়। এখানে পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার দুর্দান্ত সুযোগ থাকে।

● **নেস্ট :** ভুবনেশ্বরের নাইসার এবং মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউএম-ডিএই সিইবিএস-এ ভর্তি হওয়ার পরীক্ষা। পরমাণু শক্তি বিভাগের অর্থায়নে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা আকর্ষণীয় স্কলারশিপ-সহ গবেষণার সুযোগ পায়।

● **জেইই অ্যাডভান্সড :** দেশের শীর্ষ আইআইটি সমূহে ইঞ্জিনিয়ারিং ফিজিক্স বা বিএস ফিজিক্স কোর্সে ভর্তির জন্য এই পরীক্ষা অত্যন্ত কার্যকর। এছাড়া ব্যাঙ্গালোরের আইসিটিএস-এ বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিত 'আইসিটিএস পাবলিক লেকচার' (যেমন আইনস্টাইন লেকচার সিরিজ) আয়োজিত হয় এবং ইচ্ছুক কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য সামার ফেলোশিপের সুযোগ থাকে। স্টিফেন হকিং বা অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের নাম শুনে আমরা রোমাঞ্চিত হই। কিন্তু আমাদের হাতের কাছেই, এই ভারতেই রয়েছেন অধ্যাপক অশোক সেনের মতো এক মহীরুহ, যিনি তারতত্ত্বের জটিলতম মোড়ে আলো জ্বেলে বিশ্ববিজ্ঞানকে পথ দেখিয়েছেন।

আজকের তরুণ প্রজন্মের কাছে তাঁর বার্তা স্পষ্ট, বিজ্ঞান কোনো মুখস্থ করার বিষয় নয়, এটি হলো সততা, নিষ্ঠা আর অদম্য কৌতূহল নিয়ে প্রকৃতির পরম সত্যকে জানার এক নিরন্তর আত্মনিবেদন। আপনারা যারা আগামীকাল ভারতের বিজ্ঞানের পতাকা বহন করবেন, ডঃ অশোক সেনের এই পথচলা আপনাদের মানসপটে চিরকালীন আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে। □

বাংলাদেশে পূজায় মন্দিরের সামনে গোমাংস ভক্ষণ, ইসলামি জেহাদিরা কী নতুন বার্তা দিল?

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ বাংলাদেশ ৯২ শতাংশ মুসলমানের দেশ এটা প্রমাণ করতে কিংবা সংখ্যালঘু ৮ শতাংশ মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে শারদীয়া দুর্গাপূজার মধ্যেই মন্দিরের সামনে গোরু কেটে মহাভোজের আয়োজন করা হয়েছে। তাও আবার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় মন্দিরের সামনে অর্থাৎ সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে। জেহাদি নবীন প্রজন্ম যারা ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে তথাকথিত গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামি লিগ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর বাংলাদেশকে পূর্ব পাকিস্তানে রূপান্তর ও ইসলামি পতাকা ওড়ানোর সংকল্প করেছিল, এই লক্ষ্যে শিক্ষাঙ্গনে কতখানি কর্তৃক বিস্তার করেছে, তারই সর্বশেষ প্রমাণ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গোমাংস ভক্ষণ'।

কয়েক দফায় গোরু কেটে ভোজের আয়োজন করা হয়েছে, রান্নার উনুন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছে মন্দিরের দেওয়ালের ইট। বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিবাদ জানালেও প্রশাসন কার্যত জেহাদিদের কাছেই মাথা নত করে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান ডঃ মহম্মদ ইউনুস শপথ নিয়েই বলেছিলেন, তিনি রি-সেট করে পূর্ববর্তী সময়ে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যেতে চান, দু'ভাই একাত্তরে আলাদা হয়ে গিয়েছিল আওয়ামি লিগ ও ভারতের ষড়যন্ত্রে, সময় এসেছে তার জবাব দেওয়ার। পাকিস্তান ও তার সব কাজের দোসর তুরস্ক ইউনুসের পাশে এসে দাঁড়ায়। মাথার ওপর বিশ্বমোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো রয়েছেই। যুক্তরাষ্ট্রের 'ডিপ স্টেট' জেহাদি-অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা তৈরি ও অর্থ জোগানোর দায়িত্বে ছিল। তথাকথিত সেই গণ-অভ্যুত্থানের জেহাদিরা তাই অক্ষয় শক্তির অধিকারী। গত ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে তারেক রহমানের বিএনপি ক্ষমতায় এলেও 'ইউনুস-ধারা'র পরিবর্তন হয়নি। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে উপাচার্য ও তাঁর প্রশাসনের চরম অনৈতিক অনাচারে ও মোল্লাতন্ত্রের কাছে মাথা নত করার ঘটনা এক নতুন অধ্যায় যুক্ত করলো।



> "শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধগত জায়গাটা স্পষ্ট থাকা দরকার। যে আয়োজন অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ভীতি তৈরি করে, সেটা করা উচিত নয়। তিনি বলেন, আসলে এ ধরনের কাজের উদ্দেশ্য ভয়ের সংস্কৃতিটাকে টিকিয়ে রাখা এবং ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তার করা। —মহম্মদ তানজীমউদ্দিন খান (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক)"

বিস্তারিতভাবে 'গোমাংস ভক্ষণ' তুলে ধরার আগে এই শিক্ষাঙ্গনের ইতিহাস তুলে ধরা প্রয়োজন। দানবীর কিশোরীলাল রায়চৌধুরী জমি দান করে ১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জগন্নাথ কলেজ। সেই জগন্নাথ কলেজ ২০০৫ সালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। কিশোরীলাল রায়চৌধুরী ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর হিন্দু ছাত্রদের জন্য গড়ে তোলেন জগন্নাথ হল। হল ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যও জমি দান করেন তিনি। কিশোরীবাবুর বাবার নাম জগন্নাথ রায়চৌধুরী। যেহেতু একজন হিন্দুর নামে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত, নাম পরিবর্তনের

দাবি তোলা হচ্ছে গত এক দশক ধরে।

গত ১২ অক্টোবর রাতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা প্রথমে ক্যাম্পাসে কেন্দ্রীয় মন্দিরের সামনে গোমাংসের খিচুড়ি রান্নার আয়োজন করে। রান্নার আয়োজন নিয়ে আপত্তি জানান হিন্দু ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরা। তাদের অভিযোগ, মন্দিরের সামনে গোরুর মাংস রান্না করায় তাঁদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে। এ সময় রান্নার উনুন তৈরিতে মন্দিরের ইটও ব্যবহার করা হয়েছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হিন্দু শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেন। তারা উপাচার্যকে গিয়ে অভিযোগ জানান, এই ঘটনায় তারা অসহায় বোধ করছেন।

১৪ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর দপ্তর থেকে ক্যাম্পাসে পশু জবাই থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা দিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এতে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখার কথা বলা হয়। নির্দেশনা অমান্য করলে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের গণবিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও উল্লেখ করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে মন্দিরের সামনে গোরু জবাই করে রান্না হওয়ায় হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগার বিষয়টি কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে সিটি কর্পোরেশনের নির্দেশনার কথা উল্লেখ করা হয়। হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এটা আরেক ধরনের ভণ্ডামি বলে অভিযোগ করেন।

বিজ্ঞপ্তির প্রতিবাদে ওইদিন ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু)। সমাবেশ থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার, প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশ, ঘটনার তদন্ত, ক্যাফেটেরিয়ায় গোরু ও খাসির মাংসের ব্যবস্থা-সহ চার দফা দাবি জানানো হয়। মুসলমান শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে হুমকি দেওয়া হয়, যেহেতু বাংলাদেশে ৯২ শতাংশ মুসলমান, তাই এর প্রতিবাদে আবারও গোমাংসভোজের আয়োজন করা হবে।

বিক্ষোভের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মাথা নত করে আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দিয়ে জানায়, ক্যাম্পাসে পশু জবাই-সহ যেকোনো অনুষ্ঠান আয়োজনের অধিকার সবার রয়েছে। তবে কোনো আয়োজন যেন অন্যের অনুষ্ঠান বা কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি না করে, সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে অনাকাঙ্ক্ষিত উত্তেজনা ও ধর্মীয় সম্প্রীতির অবনতি এড়ানোর উদ্দেশ্যে প্রক্টরের পক্ষ থেকে গোহত্যা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। ওই অনুরোধের ফলে ভুল-বোঝাবুঝি তৈরি হওয়ায় প্রশাসন দুঃখ প্রকাশ করে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাথা নত করার পরও কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ১৬ অক্টোবর দুর্গাপূজার মহাষষ্ঠীর দিন আবার গোমাংসভোজের আয়োজন করে। জকসুর নির্বাচিত কমিটির সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক-সহ অধিকাংশ সদস্য জাতীয় সংসদের বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামির ছাত্র সংগঠন ইসলামি ছাত্রশিবিরের নেতা। জামায়াতে ইসলামি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদারদের পক্ষে দাঁড়িয়ে গণহত্যায় অংশ নিয়েছিল, বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল। ২০২৪ সালের কথিত গণ-আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা ছিল জামায়াত-শিবির জেহাদিদের, ছিল বিএনপি ও অন্যান্য ইসলামি দলগুলোও।

আর এর একদিন পর অর্থাৎ ১৭ অক্টোবর মহাসপ্তমীর দিন আরেক ইসলামপন্থী দল বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের ছাত্রসংগঠন ক্যাম্পাসে আবার গোমাংসভোজের ব্যবস্থা করে।

পূজার মধ্যে গোমাংসভোজ নিয়ে সরকারের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ভূমিকাও জানা যায়নি। কোনো রাজনৈতিক দল, মানবাধিকার সংগঠন এ ঘটনায় প্রতিবাদ জানায়নি। ছাত্ররা মন্দিরের সামনে শুধু গোরু কেটে ভোজই করেনি, কাওয়ালি গানের আসরও বসিয়েছে। এ স্থান থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে হিন্দু অধ্যুষিত শাঁখারিবাজার এলাকা, যেখানে বেশ কয়েকটি দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়। শাঁখারিবাজারের পরই তাঁতিবাজার, আরেক হিন্দুপ্রধান এলাকা। অন্যদিকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব দিকে রয়েছে লক্ষ্মীবাজার, বাংলাবাজার। তাঁতিবাজার, লক্ষ্মীবাজার ও বাংলাবাজারেও অন্তত এক ডজন মণ্ডপে পূজা হয়। এই পূজাগুলো সবই ঐতিহ্যবাহী। কোনো কোনো পূজা শতাব্দী প্রাচীন।

স্বাভাবিকভাবে পূজার মধ্যে শিক্ষাঙ্গনের ভেতরে মন্দিরের সামনে 'গোমাংসভোজ' -এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। গোটা এলাকায় অন্তত এক ডজন স্কুল কলেজও রয়েছে। এ নিয়ে হিন্দুদের মধ্যে তৈরি হয়েছে নতুন শঙ্কা ও উদ্বেগ। বিশেষ করে জেহাদি ছাত্ররা মনে করিয়ে দিয়েছে, বাংলাদেশে ৯২ ভাগ মুসলমানের দেশ।

লেখক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ গোমাংসভোজ নিয়ে সমাজ মাধ্যমে এক পোস্টে লিখেছেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটা করে গোরু জবাইয়ের তাৎপর্য অপরিসীম। শিগগিরই জাতি এটা বুঝতে পারবে। এ আয়োজনের মাধ্যমে কী কী অর্জন হলো— তা ব্যঙ্গাত্মকভাবে ওই পোস্টে তুলে ধরেন তিনি। আরও লেখেন, আমরা যে একটি স্বাধীন দেশ, শিক্ষাঙ্গনে গোরু জবাইয়ের মাধ্যমে আবারও প্রমাণিত হলো। এতদিন আমরা সত্যিকার স্বাধীনতার স্বাদ পাইনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে গোরু জবাই করতে না পারলে আবার কীসের স্বাধীনতা!

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে গোমাংসভোজের আয়োজনে ধর্মবিদ্বেষের প্রকাশ দেখছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক মহম্মদ তানজীমউদ্দিন খান। তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধগত জায়গাটা স্পষ্ট থাকা দরকার। যে আয়োজন অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ভীতি তৈরি করে, সেটা করা উচিত নয়। তিনি বলেন, আসলে এ ধরনের কাজের উদ্দেশ্য ভয়ের সংস্কৃতিটাকে টিকিয়ে রাখা এবং ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তার করা। অন্যের মধ্যে ভীতি তৈরি করে, এ ধরনের কাজ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বা অন্য কোথাও করা যায় কি না, সেটা বিবেচনায় রাখা উচিত। □

কাশ্মীর ভ্রমণ : ৩৭০ ধারা বিলোপের আগে ও পরে

খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল

বার বার তিনবার। ভূস্বর্গের রূপ লাবণ্য, অতুলনীয় প্রাকৃতিক দশ্য, পাহাড়-জঙ্গলের চোখ-ধাঁধানো শোভা— যা আমার দেখা সুইজারল্যান্ডকেই হার মানায় তা আর একবার দেখার আকুতি— এই আশি ছুঁই-ছুঁই বয়সও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। এবারের কাশ্মীর ভ্রমণ ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির পরেই শুধু নয়— গত বছর ২২ এপ্রিল বৈসরণ উপত্যকায় বর্বরোচিত জঙ্গি হানায় ২৫ জন হিন্দু পর্যটকদের জীবন নাশের পরে। সঙ্গী পরিবারের বাকি সদস্যদের অবশ্য এবারেই প্রথম পদার্পণ। নরেন্দ্রপুর মিশনে পাঠরত দৌহিত্র নৈঋতের অদমনীয় আগ্রহই এবারে কাশ্মীর যাত্রার অনুপ্রেরণা। তাছাড়া ৩৭০ ধারা বিলোপের পরে কাশ্মীর কেমন আছে তা দেখার তাগিদ ছিল আমার।



স্ত্রীকে নিয়ে ১৯৮৬-তে এবং স্ত্রী-কন্যা-সহ ২০০৩ সালে কাশ্মীর, লে-লাদাখ ভ্রমণকালে পহেলগাঁওয়ের অন্যতম আকর্ষণ বৈসরণ যাওয়ার ইচ্ছা ছিল শুধু নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগের জন্যই নয়— সম্ভবত ২০২৫-এর জঙ্গি হানা পর্যটকদের বৈসরণ যাওয়ার আগ্রহ বাড়িয়েছে, কিন্তু প্রত্যাশা পূরণ হয়নি ওই স্থানটি বন্ধ থাকার জন্য। যদিও পহেলগাঁওয়ে হিমশীতল রাত্রি যাপন এবং অন্যান্য স্থানগুলি গাড়ি নিয়ে ঘুরে উপত্যকার অনিন্দ্যসুন্দর প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ ব্যাহত হয়নি সুন্দর আবহাওয়ার জন্য। পহেলগাঁও ছাড়াও গুলমার্গ, সোনমার্গ এবং জিরো পয়েন্টে বরফ নিয়ে খেলতে পারায় দৌহিত্র নৈঋত মহাখুশি। আগের চেয়ে স্বাভাবিক কারণেই ডাললেকে শিকারা ভ্রমণ অনেকটা খরচ সাপেক্ষ হলেও লেকের সৌন্দর্য, পরিচ্ছন্নতা ও স্নিগ্ধতায় আমাদের শিকারা ভ্রমণ উপভোগ্য হয়েছে। তদুপরি নৌকার মাঝির অমায়িক ব্যবহার, সহযোগিতায় আমরা আপ্লুত। অধিকন্তু, ডাললেকের কাছে বুলেভার্ড রোডে হাটেল প্যালেসে ঘর পাওয়ায় লেকের সৌন্দর্য উপভোগ ছিল অকল্পনীয়। হোটেলের ম্যানেজার, কর্মী এবং সবসময়ে ড্রাইভার নাসিরের চমৎকার ব্যবহার, ভদ্রতা কাশ্মীর ভ্রমণের দিনগুলি আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছে।

ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কাশ্মীর ভ্রমণ এই নিবন্ধের গৌরচন্দ্রিকা হলেও, এর উপজীব্য ৩৭০ ধারা পরবর্তী কাশ্মীরি মানুষের জীবনযাত্রায় এর অভিঘাত। ২০১৯-এর ৫ আগস্ট ভারত সরকার কাশ্মীরে চালু থাকা ৩৭০ এবং ৩৫ (এ) ধারা রদ করে। এই দু'টি ধারা কাশ্মীরিদের অবশিষ্ট ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিশেষ মর্যাদা প্রদানের মাধ্যমে। সংবিধানে ৩৭০ ধারা যুক্ত করে কংগ্রেস সরকার ১৯৪৯ সালের অক্টোবরে এবং ৩৫ (এ) ধারাটি যুক্ত হয় ১৯৫৪ সালে। এর প্রণেতারা ব্যবস্থাটি সাময়িক বললেও ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত এটি বহাল ছিল। সংবিধানের এই বিশেষ মর্যাদা দান কাশ্মীরিরা তাদের জাত্যভিমানের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে এবং ৩৭০ ধারা এবং 'কাশ্মীরিয়ত' একে অন্যের পরিপূরক ভাবা হয়। সুতরাং আইন করে ৩৭০/৩৫ (এ) ধারাগুলির অবলুপ্তির কাজ যেকোনো যুদ্ধ জয়ের থেকেও কঠিন ছিল এবং ৩৭০-এর বিলোপ সাধন এতদিন অসম্ভব বলেই মনে করা হতো— আর এই অসম্ভবই সম্ভব হয়েছে মোদীজী-অমিত শাহের 'অমিত বীর্যে'।

বহুচর্চিত ৩৭০ ধারা এবং ৩৫ (এ) ধারায় বিশেষ সুবিধাগুলির অন্যতম হচ্ছে জম্মু-কাশ্মীরের জন্য আলাদা সংবিধান এবং জাতীয় পতাকা। এমনকী ভারতীয় সংসদে প্রণীত আইন কাশ্মীর সরকারের অনুমোদন ছাড়া কাশ্মীরে বলবৎ হবে না। ফলে ৮৯০টি কেন্দ্রীয় আইন কাশ্মীরে প্রয়োগ করা যায়নি। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ভিনরাজ্যের মানুষ বা ব্যবসায়ীরা এখানে ব্যবসা বা কারখানা করার জন্য জমি কিনতে পারবে না। ফলে কাশ্মীর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গ হয়েও একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপভূমির মতো ছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কারমূলক বিধিগুলির বাইরে ছিল। এতে যে শুধু কাশ্মীরিরা বাকি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে তাই নয়— ভারত সরকারের উন্নয়ন যজ্ঞের শামিল হওয়ার সুযোগ হারায়। ক্রমবর্ধমান অনুন্নয়ন, বেকারত্ব এবং ভারত বিরোধী মনোভাব জন্ম দেয় উগ্রপন্থা— এতে ঘৃত সংযোগ করে প্রতিবেশী পাকিস্তান। কাশ্মীরিরা ভারতীয়ত্ব থেকে কাশ্মীরিয়তকে ঊর্ধ্বে স্থান দেয়। ৩৭০ ধারা বিলোপের অর্ধ দশক পরে ফিরে দেখা যাক— ৩৭০ ধারা বিলোপ কাশ্মীরিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে কি-না?

১৯৮৬-র কাশ্মীর সফর এবারের মতোই অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির দর্শন দিয়েই শুরু হয়েছিল। তবে তখনকার অমৃতসর স্বর্ণমন্দির দর্শন এবং অন্যান্য দর্শনস্থল ঘোরা এবারের মতো প্রাণোচ্ছল ছিল না— কারণ তখনো অপারেশন ব্লুস্টার এবং ইন্দিরা হত্যার ছায়া ঘিরে রেখেছিল স্বর্ণমন্দির চত্বর। এবারে দুর্গাপূজার প্রাক্কালে স্বর্ণমন্দির অপূর্ব আলোকমালায় সুসজ্জিত ছিল। নব কলবরে এবং সৌন্দর্যায়নে নবরূপে দেখা পবিত্র স্বর্ণমন্দির মন ভরিয়ে দিল— অপলক দৃষ্টিতে বারবার তাকিয়ে থাকলাম মন্দিরমুখী হয়ে। মন্দিরের কাঠামো, চলাচলের রাস্তা পরিচ্ছন্ন রাখতে শত শত স্বেচ্ছাশ্রমী ভক্তদের কাজ করতে দেখে হিন্দু তীর্থের অব্যবস্থার তুলনা মনে ভেসে উঠল (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া)। মাঝে একদিন জম্মুতে রাত কাটিয়ে পরের দিন ভোরের বন্দে ভারতে ভূস্বর্গে যাত্রা শুরু হলো।

প্রথমবার ১৯৮৬-তে ভূস্বর্গে পদার্পণ আর এবার ২০২৬ এই ৪০ বছরে ঝিলাম, চেনাব, রাভি ও তাওয়াই নদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। ১৯৮৬ ও ২০০৩-এর কাশ্মীর সফরকালে প্রতি মুহূর্তে জঙ্গি হানার ভয়ে গুটিয়ে থাকতাম, বিশেষ করে রাতের বেলায় হোটেলের বাইরে বেরনোর সময় এমনকী লালচক এলাকায় নানা ব্যারিকেড করে যান নিয়ন্ত্রণ করতে দেখেছি দিনের বেলায়ও। রোজই কোথাও না কোথাও উগ্রপন্থী-সেনার লড়াই বা এনকাউন্টার নিয়ে কাশ্মীর সরগরম থাকতো, এমনকী ট্যুরিস্ট বাসে আক্রমণের মতো ঘটনাও হরদম ঘটত। অথচ এবারে ২০২৫-এ পহেলগাঁওয়ে পাকিস্তানের প্ররোচনায় জঙ্গিরা বেছে বেছে ২৫ জন হিন্দু পর্যটককে নির্মমভাবে হত্যা করার পরেও সেই পহেলগাঁওয়েই নিঃসঙ্কোচে ও নির্ভয়ে রাত কাটিয়েছি, বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছি, কাশ্মীর এতটাই স্বাভাবিক। তবে অতর্কিতে উগ্রপন্থীদের কাপুরুষোচিত হামলার ঘটনা কখনো কোথাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তবুও এই নিরাপত্তা বোধের অন্যতম কারণ কাশ্মীর প্রকৃতার্থে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেই কি এই মনের জোর? এর উৎস কি ৩৭০ ধারা রদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে— যার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে ভ্রমণের মতো কাশ্মীরে স্বাভাবিক নিরাপত্তা বোধ? বরং কাশ্মীরিদের বন্ধুভাব এবং ভালো ব্যবহার অতিরিক্ত নিরাপত্তা বোধের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ আমার জন্মভিটা, ওখানের মাটিতেই বড়ো হওয়া, এখন কিছু কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ আছে— তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে গেলে যতক্ষণ না বাংলাদেশ বর্ডার ক্রস করে ভারতে ঢুকছি— ততক্ষণ একটা চাপা উদ্বেগ মনের ভিতর কাজ করে, যদিও বহুবার বাংলাদেশে ভ্রমণ সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কোথাও কোনো অঘটনের সম্মুখীন হইনি, তাও কেন এই মানসিক আতঙ্ক? অনুরূপভাবে ৩৭০/৩৫ (এ) ধারাগুলিই কি অ-কাশ্মীরিদের উপর মানসিক চাপ সৃষ্টির কারণ ছিল? এবারের কাশ্মীর ভ্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা।

কাশ্মীরের অর্থনীতি পর্যটন নির্ভর। জম্মু-কাশ্মীরের জিডিপির প্রায় ৬১ শতাংশ আসে পর্যটন থেকে, ২০ শতাংশ কৃষি এবং কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের দ্বারা, বাকি ১৯ শতাংশ আসে ছোটো ও মাঝারি শিল্প কারখানায় উৎপাদন থেকে। কাশ্মীরি উইলো কাঠের তৈরি ব্যাট খুবই জনপ্রিয়— যার চাহিদা রয়েছে পুরা ভারতবর্ষে। ৩৭০ ধারা ও ৩৫ (এ) অবলুপ্তির পরে এখানকার কিছু শিল্পপতিরা বিনিয়োগের আগ্রহ দেখাচ্ছেন, কেননা বাইরের লোকের জমি কেনার প্রতিবন্ধকতা ৩৫ (এ) ধারাও ৩৭০ বাতিলের সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিয়েছে। পৃথিবীর অন্যতম উচ্চতায় রেললাইন স্থাপন করে জম্মু থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত রেললাইন চালু এবং বন্দে ভারতের রীতিমতো যাতায়াত কাশ্মীরে ট্যুরিস্ট যাতায়াতে আরও বেশি গতি এনেছে। ৩৭০ ধারা বিলোপের পরে ভারত সরকারের সরাসরি পরিকাঠামোতে বিনিয়োগের ফলে রাস্তাঘাটের দ্রুত উন্নতি হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সোনমার্গ টানেল চালু হয়েছে এবং ১২ হাজার ফুট উঁচুতে শ্রীনগর-কার্গিলের পথে ১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ জোজিলা টানেল নির্মাণের কাজ চলছে। এটি চালু হলে যে রাস্তার দূরত্ব অনেকটাই কমবে শুধু তা নয়, বরং শীতে বরফাবৃত হয়ে রাস্তা বন্ধের ঝুঁকিও কমবে। ২০২৬-২৭ সালে অর্থবর্ষে ভারত সরকার কাশ্মীরে কেন্দ্রীয় সাহায্য বরাদ্দ করেছে ৪৩২৯০ কোটি টাকা। ভারত সরকারের লক্ষ্য ৩৭০ পরবর্তী কাশ্মীরের উন্নয়নের ধারা যেন কাশ্মীর মানসে প্রভাব ফেলে।

আসলে ৩৭০ ধারা যে কাশ্মীর ভাবাবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে এক ধরনের কাশ্মীরি জাত্যভিমান বা কাশ্মীরিয়ত তৈরি করা ছাড়া কাশ্মীরিদের উন্নয়নের প্রতিবন্ধক ছিল— একথাটা এখন অনেকেই বুঝেছে। আগের দমবন্ধ পরিবেশ থেকে বর্তমানের খোলামেলা ব্যবস্থা কাশ্মীরিদের সার্বিক উন্নয়নে সহায়ক হবে এটা ভাবতে শুরু করেছেন যুবসমাজ। পরিবর্তনের এই পাঁচ বছরে মানুষ বুঝতে পেরেছেন ৩৭০ ধারা বিলোপের পিছনে ভারত সরকারের কোনো অশুভ কাশ্মীর বিরোধী উদ্দেশ্য নেই। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাটি যা ১৯৪৭-এর বিভাজন তত্ত্বের ফর্মুলা অনুযায়ী ভারতে যুক্ত হওয়ার কথা ছিল, ওখানের জনগণের প্রায় ৯৩ শতাংশ ছিল জনজাতি সম্প্রদায়ের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পরে বিশেষত ১৯৭১-এ পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশে রূপান্তরিত হওয়ার পরে ক্রমাগত মুসলমান অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে চাকমা বৌদ্ধদের জনসংখ্যা ৫০ শতাংশ নামিয়ে আনা হয়েছে— যাতে বৌদ্ধরা তাদের স্বকীয়তা এবং প্রাধান্য বজায় রাখতে না পারে। কাশ্মীরিদের ব্যাপারে ভারত সরকারের যে এমন কোনো চক্রান্ত নেই— কাশ্মীরিরা তা উপলব্ধি করেছেন এত দিনে। ভারত সরকারের ৩৭০ ও ৩৫ (এ) ধারা বিলোপের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা— যাতে দেশের অগ্রগতির শরিক হতে পারেন কাশ্মীরিরা। আর কাশ্মীরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলে— বেকারত্ব কমলে, যুব সমাজ আধুনিক এবং প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে আগ্রহী হলে, তারা আর উগ্রপন্থায় যুক্ত হবে না। এতদিনে কাশ্মীরের যুবসমাজ উপলব্ধি করেছেন, উগ্রপন্থায় তাদেল লাভ কিছু নেই কেননা উগ্রপন্থার দ্বারা ভারতকে অবদমিত করা যাবে না। তাছাড়া ইন্ধন জোগানো পাকিস্তানই আজ গভীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটের মুখোমুখি, তথাকথিত আজাদ কাশ্মীরেই জিগির উঠেছে তারা পাকিস্তানে থাকতে চায় না— সেই পাকিস্তানে যুক্ত হতে কেন চাইবেন সাধারণ কাশ্মীরিরা?

এবারের কাশ্মীর ভ্রমণ শুধু যে নৈসর্গিক আনন্দ দান করেছে তাই নয়, কাশ্মীরিদের স্বভাবসুলভ সৌজন্য এবং আতিথেয়তার বাইরেও এক কুটুম্বিতায় ছোঁয়াচ দিয়েছে, তা শুধু 'আপলোক হমারা মেহম্যান হ্যায়'-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সপ্তাহকালীন ভ্রমণে ঘোড়াওয়ালা থেকে গাড়িচালক, হোটেলের ম্যানেজার থেকে কর্মচারী সবাই যেন আত্মীয় মনে হয়েছে। সোনমার্গে গাড়িচালক নাসিরকে পাকিস্তান কত দূর জানতে চাওয়ায় উত্তরে বলে 'হমারা ইন্ডিয়াছে...' যে প্রশ্নের উত্তর ১৯৮৬/২০০৩ আসত— 'হমারা কাশ্মীরছে...'। এটাই হয়তো ৩৭০ ধারা বিলোপের ফলশ্রুতি বা গ্রাউন্ড রিয়েলিটি। বারবার কাশ্মীরে গিয়ে মনে হয় 'সারা জাহাছে আচ্ছা— হিন্দুস্থাঁ হমারা' এই শায়েরটি কাশ্মীর দেখেই মহম্মদ ইকবাল লিখেছেন।

(লেখক ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য প্রবন্ধক)

অনুপ্রেরণার উৎস এবং জাতীয় গর্বের একটি দলিল

ড. তপন চট্টোপাধ্যায়

'দ্য গ্রেট সন্স অ্যান্ড ডটার্স অব ইন্ডিয়া' বইটি লিখেছেন সৌমক পালিত। এটি ২০২৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর কলকাতার প্রেস ক্লাবে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই বইটিতে লেখক সৌমক পালিত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বত্রিশজন বিপ্লবীর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা তুলে ধরেছেন। বইটিতে উল্লিখিত তথ্য ও ঘটনাগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, পুলিনবিহারী দাস, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, রাসবিহারী বসু, বসন্ত কুমার বিশ্বাস, রাজেন্দ্র লাহিড়ী, ভগৎ সিংহ, মাস্টারদা সূর্য সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, বীণা দাস, প্রফুল্ল সেন, তারকেশ্বর সেনগুপ্ত, বাঘা যতীন, কানাইলাল দত্ত, নীরা আর্য, পারুল মুখার্জি, যতীন দাস, উল্লাসকর দত্ত, প্রফুল্ল চাকী, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, সন্তোষ মিত্র, সুনীতি চৌধুরী, শান্তি ঘোষ, রাজশেখর বসু, আচার্য গিরীন্দ্রশেখর বসু প্রমুখের পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের সদস্যদের কাছ থেকে। এছাড়া, এই বইয়ের মাধ্যমে পাঠকরা তিলকা মাঝির কথা জানতে পারবেন, যিনি মঙ্গল পাণ্ডের অনেক আগেই বীরগতিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

এটি বইটির প্রথম খণ্ড। পরবর্তী খণ্ডগুলোতে আরও অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীর অবদান তুলে ধরার জন্য কাজ করছেন। বইটির ভূমিকা লিখেছেন স্যার জেমস সাটক্লিফ (ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্যার জর্জ ক্যানিং-এর প্রপৌত্র) এবং কসোভো সরকারের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত মিমোজা আহমেতাজ।

'দ্য গ্রেট সন্স অ্যান্ড ডটার্স অব ইন্ডিয়া' বইটির লেখক শ্রী পালিত জানিয়েছেন যে, এই বইটি লেখার পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য হলো এটি তুলে ধরা যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম— ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লব, আইরিশ বিপ্লব, আমেরিকান বিপ্লব বা চীনা বিপ্লবের তুলনায় কোনো অংশেই কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। তবে বিড়ম্বনার বিষয় হলো, অন্যান্য বিপ্লবের তুলনায়

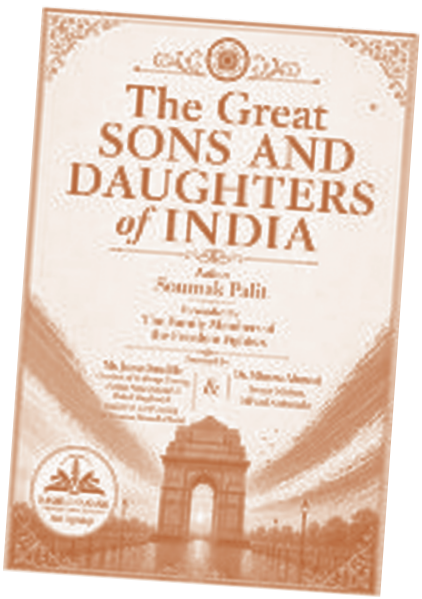

বিশ্বজুড়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে সেই গুরুত্বের সঙ্গে পড়ানো হয় না। বইটি ব্রিটিশ ন্যাশনাল লাইব্রেরি, ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব ওয়েলস্, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বোডলিয়ান লাইব্রেরি, জাপান ন্যাশনাল লাইব্রেরি এবং ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব শ্রীলঙ্কা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজ সংস্কারক থেকে শুরু করে বহু চিন্তাবিদ, নেতা, বিজ্ঞানী, শিল্পী ও সমাজকর্মী— এই বইটিতে তাঁদের অমূল্য অবদানকে তুলে ধরা হয়েছে, যা আজও প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে অনুপ্রেরণা জোগায়। সুনিপুণ গবেষণা ও চিত্তাকর্ষক সব ঘটনার বর্ণনার মাধ্যমে লেখক সৌমক পালিত এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বদের আদর্শ, সংগ্রাম ও সাফল্যের কাহিনিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। এটি কেবল কিছু গল্পের সংকলন নয়, বরং প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস এবং জাতীয় গর্বের এক দলিল।

বইটির বিষয়ে বলেন মহাপরিচালক এবং 'দ্য স্টোরি অব লালবাজার : ইট্স্ অরিজিন অ্যান্ড গ্রোথ' ও 'রাইভালরি দ্যাট কস্ট ইন্ডিয়া : জওহরলাল নেহরু, সুভাষ বসু, অ্যান্ড কংগ্রেস পলিটিক্স ১৯২১— ১৯৪১' বই দুটির লেখক) শ্রী জয় ভট্টাচার্য (স্বাধীনতা সংগ্রামী কল্যাণী দাসের পুত্র— যিনি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী বীণা দাসের বড়ো দিদি) এবং শ্রী প্রদীপ ভট্টাচার্য (প্রাক্তন সংসদ)। বইটি আগামী দিনে লন্ডন থেকেও প্রকাশিত হবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পরিবারের সদস্য শ্রী প্রসাদ রঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পরিবারের সদস্য শ্রী চন্দ্র বসু, পুলিনবিহারী দাসের পরিবারের সদস্য শ্রী বিশ্বরঞ্জন দাস এবং মাস্টারদা সূর্য সেনের পরিবারের সদস্য শ্রীমতী মিতা মিত্র— এই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বর্তমান প্রজন্মের প্রতিনিধিরা বইটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো জানার জন্য বইটি পড়ার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

লেখক : সৌমক পালিত। প্রকাশক : বসুধানন্দ বুকস অ্যান্ড পাবলিশার্স। প্রাপ্তি স্থান : কলেজ স্ট্রিট। মূল্য : ১০৫০/-